ঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃ

ভাষা ঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ–এর ভাষা, রাজবংশী ভাষা ব্যবহারে বিশেষত্ব

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা ঃ রাজবংশী ভাষা ব্যবহারে বিশেষত্ব

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' দুটি উপন্যাসই বাংলা ও রাজবংশী বা কামরূপী উপভাষায় লেখা। বর্ণনার ভাষা বাংলা, কিন্তু কথোপকথনের ভাষা বাংলা, প্রধানত রাজবংশী। কেন লেখক রাজবংশী ভাষা ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে যাওয়ার আগে রাজবংশী ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী রাজবংশীরা। রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন, "The history of the origin of the Rajbansis is a mystery. It is said that they belong to the great Bodo family that entered India in 10th century B.C, from the east & settled on banks of the Brahmaputra and gradually spread over Assam and whole of North East Bengal" ১ এ প্রসঙ্গে সুখবিলাস বর্মাও উল্লেখ করেছেন "....তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তির উপরে ভিত্তি করে রাজবংশী জাতির উদ্ভব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আপত্তি থাকা উচিত নয় যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে পৌন্ড্রবর্ধন থেকে দ্রাবিড় বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি অংশ তৎকালীন কামরূপ, সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গে বসবাস শুরু করে। এর কিছুকাল পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তিব্বত চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃহৎবোড়ো শাখার তিব্বত-ব্রহ্মভাষী কোচ, মেচ, বোড়ো, কাছারি, রাভা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এই উপজাতিগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল অংশটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সমন্বিত জন গঠন করে। এই সমন্বিত জনগণই রাজবংশী সমাজ, যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা যায়।" ২

এই রাজবংশীদের কথ্য ভাষা-ই হল রাজবংশী ভাষা। এরই নামান্তর 'কামরূপী উপভাষা'। কামরূপী উপভাষা বা রাজবংশী ভাষা বাংলাভাষারই একটি উপভাষা।

"উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রথম ভাষাটি শুধু প্রশাসনিক—'জলপাইগুড়ি বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রশাসনিক সীমানা পেরিয়ে ভারতের প্রদেশান্তরে (যেমন, আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলা) এবং ভারত রাষ্ট্রের বাইরেও (বাংলা দেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলা) এর বিস্তার।" ৩

এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই উপভাষার বিস্তার হেতু স্বাভাবিক ভাবে এর উচ্চারণে, রূপে কিছু কিছু পার্থক্য এসে গেছে, ব্যাকরণের ভাষায় যাকে বলে বি-ভাষা। রাজবংশী ভাষাভাষী মূল অঞ্চলটি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শ পঞ্চাশ পর্যন্ত কোচবিহারের শাসনাধীন ছিল। এজন্য রাজবংশীভাষার Standard ধরা হয় কোচবিহারের রাজবংশী ভাষাকে।

কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) শিষ্ট বাংলার আদিতে 'ল' যুক্ত শব্দে কোচবিহার ও রংপুর-এ 'ল'- এর পরিবর্তে 'ন' হয়। অন্যান্য অঞ্চলে ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শিষ্ট বাংলা	কোচবিহার/রংপুর	অন্যান্য অঞ্চলে
ললিত	নলিত	নলিত
লাজ	নাজ	লাজ
লাল	নাল	লাল

(২) শব্দের আদি অবস্থানে 'র' 'অ' হয়ে যায়, কোনো কোনো অঞ্চলে র'ই থাকে —

রক্ত	অক্ত	অক্ত
রহ (থাকা)	অ	রহ
রঙিলা	অঙ্গিলা	রঙিলা

(৩) শব্দের আদিতে 'ও' থাকলে কোচবিহার ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে 'ও', 'অ' হয়ে যায়।

বোকা	বোকা	বকা
পোকা	পোকা	পকা
দোহলা (নিচু জমি)	দোলা	দহলা

(৪) কোচবিহার ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে পরিণত হয়।

আঠিয়া	আটিয়া	আঠিয়া
এই ঠাই	এইটে	এইঠে
লাঠি	নাটি	লাঠি

(৫) মহাপ্রাণ প্রবণতার জন্য কোচবিহার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে কোথাও কোথাও মহাপ্রাণে পরিণত হওয়ার

পরিবর্তে ব্যঞ্জনের পরে একটা 'হ' ধ্বনির আগম ঘটে।

চা	চা	চাহা
ওরা	উমা	অম্হা
তোমার	তোমার	তোম্হার

(৬) কোচবিহারে শব্দের মধ্যবর্তী নাসিক্যব্যঞ্জন মহাপ্রাণতার দিকে ঝোঁক থাকার ফলে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে অনেক সময় মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে পরিণত হয়।

সাঁতার অর্থে	পঙোর	পহ্র
বামন	বামোন	বাভোন

(৭) 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলি উষ্মীভূত হয়। 'জ' হয়ে যায় জ় (Z)

জল	জল	জল
চল	চল	চল
ঝাড়ু	ঝারু	ঝারু

(৮) এই উপভাষার ড় এ ঢ় সর্বত্রই যথাক্রমে 'র' কোনো কোনো স্থানে (কোচবিহার ব্যতীত) 'রহ' হয়।

বাড়ি	বারি	বার্হি
বড়	বর	বর্হ
আষাঢ়	আশার	আশারহ্

(৯) কামরূপীতে শ, ষ, স, প্রায়শই বঙালির মতো 'হ' এর ঝোক দেখা যায়। শালা—শাহ্লা, বিষ—বিহ্ষ, সংগ্রাম—সহংগ্রাম।

(১০) পদ মধ্যে অ-কারের উ-কার প্রবনতা লক্ষ করা যায়

এমন	এমুন	এমুন
তখন	তখুন/সেখুন	সেখুন

(১১) রাঢ়ী বা বঙালিতে ব্যবহৃত 'স' কামরূপীতে 'শ' হয়।

সকাল	শাকাল	শাকাল
রস	অশ	রশ

সন্ধ্যা	সইঞ্ঝা	শাইঞ্ঝা

(১২) পদাদিতে এ-কারের অ্য-কার প্রবনতা লক্ষ করা যায়

দেবেশ	দ্যাবেশ	দ্যাবেশ
মেঘ	ম্যাঘ	ম্যাঘ
দেশ	দ্যাশ	দ্যাশ

(১৩) স্বর সংগতির ফলে কামরূপীতে কখনও 'এ'-কার হয়ে যায় 'ই'-কার এবং 'ও'-কার হয়ে যায় 'উ' কার।

শিবেন	শিবিন	শিবিন
নৃপেন	নিপিন/নিরপিন	নিপিন/নিরপিন
কোকিল	কুকিলা	কুকিলা

(১৪) স্বরধ্বনির বিবর্তন বঙালী বা রাঢ়ির মতো কামরূপীতে অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

যেমন—

কল্য—কল্লি—কালি—কাইল—কাল্

অদ্য—আজি—আজি—আইজ—আজ

কামরূপীতে যথাক্রমে 'কালি' ও 'আজি' ব্যবহৃত হয়।

(১৫) ধ্বনি রূপান্তরের আরও কতগুলি রূপ নিচে দেওয়া হলো।

ক) সমীভবন : বাক্য—বাইক্‌কো, ভর্ত্তি—ভত্‌তি, খরচা—খচ্চা

খ) বিষমীভবন : শরীর—শরীল, লালসা—নালোচ

গ) ধ্বনি বিপর্যাস : জ্যোৎস্না—জোনাক, মাংস—মশোং, গোবিষ্টা—ঘইশা

ঘ) ঘোষীভবন : শকুন—শগুন,

ঙ) মহাপ্রাণীভবন : বাসা—ভাসা, যত—ঝতো স্তবক— থোকা

চ) অল্পপ্রাণীভবন : মাথা—মাতা, মেঝে— মাজিয়া, দুধ—দুদ

ছ) নাসিক্যীভবন : প্রকৃত পক্ষে রাজবংশীতে নাসিক্য ধ্বনি নেই।

জ) মূর্ধন্যীভবন : তির্যক—ট্যারা, দাড়িম্ব—ডালিম,

কামরূপী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ—

শব্দ, প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি, পদ, লিঙ্গ, বচন ইত্যাদি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। সর্বপ্রথম 'শব্দ' নিয়ে কামরূপী উপভাষার স্বরূপ আলোচনা করা যাক।

শব্দ ঃ

ক) মৌলিক শব্দ : মাও, বাপো, ভাতার, চ্যাংড়া, মাইয়া (স্ত্রী) ইত্যাদি।

খ) সাধিত বা প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ :

১) কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ : আই — ঝার + আই = ঝারাই, আরু—ডুব + আরু = ডুবারু, উরা—হাগ্ + উরা= হাগুরা, তি—উঠ্ +তি = উঠতি

২) তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ : আর—বাদি + আর = বাদিয়ার, ওয়াল—ঘাট + ওয়াল = ঘাটোয়াল, আরু—বাঘ = বাঘারু।

তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাম ধাতু গঠন করে।

আ— ভাটি+আ=ভাটিয়া, হলদি+আ=হলদিয়া

আনি—ঠ্যাঙা+আনি=ঠ্যাঙানি, নাক+আনি=নাকানি

৩) দেশী প্রত্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কামরূপীতে লক্ষ করা যায়। কাটা—চ্যাদেরা + কাটা = চ্যাদেরা কাটা, বারি—ধান +বারি, পাটা+বারি পাটাবারি, নাগা—শ্যাপ্টা + নাগা = শ্যাপ্টানাগা; হাটি—গুয়া + হাটি = গুয়াহাটি, চাউল + হাটি = চাউলহাটি।

গ) সমাসবদ্ধ শব্দ : আজু-আবো, চ্যাংড়া-চ্যাংড়ি, ভুলা-মাসান, আংসাঙ-বাউদিয়া ইত্যাদি।

উপসর্গ : নি + লাজ = নিলাজ, বি-ধুয়া = বিধুয়া, হা-ভাতিয়া = হাভাতিয়া

অনুসর্গ : বাদে — তোরবাদে, দিয়া — চুনদিয়া ইত্যাদি।

পদ ঃ

১) বিশেষ্য : কামরূপীতে কারক বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ ভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ দেখা যায়। যেমন—

ক) কারক — কর্তৃকারকে 'শূণ্য', 'এ' বিভক্তি—

গরু ধান খাইচে। ঠ্যালাৎ বাগে ঘাস খায়।

খ) কর্মকারক ও সম্প্রদানকারকে স্বরান্ত পদে 'ক' এবং ব্যাঞ্জনান্ত পদে 'ওক' বিভক্তি—নরেনোক খবর দ্যাও। আবোক চাউটালি করা যায়।

কখনও কর্মকারকে শূণ্য বিভক্তি হয়। যেমন—মুই ভাত খাঙ্

গ) করণকারকে 'দ্বারা' 'দিয়া' যোগে— মোর দ্বারা হবার নয়। মোক দিয়া করেবার না পাবু।

ঘ) অপাদানকারকে 'হাতে' 'থাকি' যোগে—ধানবাড়ি হাতে মানষিটাক্ ডেকাও। কোটে থাকি আসিলেন?

ঙ) সম্বন্ধ পদ—'র', 'এর' যোগে—

গরুর বাছুর হইছে। ঘরের পাছিলাৎ ঢোলা ব্যাঙ।

চ) অধিকরণকারকে 'ত্', ওত্, টে, ঠে যোগে—

ঘরোত থাকোঙ। নদীত্ জল নাই। সত্যেনেরটে বইখান আছে। হামারঠে কহ্দি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'ঘরোত্', 'নদীত্', স্থানার্থে এরকম ব্যবহার হলেও জিজ্ঞাসা সূচক কোথায় র ক্ষেত্রে 'কোটত্' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে কোনটে, কোটে, কোন্ঠে হয়।

২) সর্বনাম পদে 'বচন'—'লার' 'গুলা', 'লা' যোগে বহুবচন হয়—

সর্বনাম	একবচন	বহুবচন
মুই (আমি)	মুই	আমরা/হামরা
তুই (তুমি)	তুই	তোমরা/তম্রা
উয়ায় (সে)	উয়ায়/উমায়/তায়—	উমরা/অম্রা
অর (ওর)	অর/ওর	উমরালার
তোমরা (আপনি)	তোমরা/তমরা	তোমরালা/তমরালা

'তুই' সর্বনামটির কারক, বিভক্তি, বচন-এর রূপ ঃ

কারক	একবচন	বহুবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ	তুই	তোমরা	তোমরালা/তোমরাগুলা
কর্ম	তোক	তোমার/তমাক	তোমরালাক /তোমরাগুলাক
করণ	তোকদিয়া/তোর দ্বারা	তোমার দিয়া/তোমরালাক দিয়া	তোমরাগুলাক দিয়া/দ্বারা
সম্প্রদান	তোক্	তোমাক/তমাক	তোমরালাক/ তোমরাগুলাক
অপদান	তোমরাটে হ্যাতে/থাকি	তোমারটে হ্যাতে/থাকি	তোমরালারটে হ্যাতে/থাকি

সম্বন্ধ	তোর	তোমরা/তমার	তোমরালার/ তোমরাগুলার
অধিকরণ	তোরটে	তোমরাটে	তোমরালারটে/ তোমরাগুলারটে

৩) বিশেষণ পদের বিন্যাস ঃ

গুণবাচক : ভাল্, বেহা/ বেয়া, বর্‌হ ছোট/ছট্, ডাঙ্গর,

সংখ্যাবাচক : একটা, দুকনা, দোকলা, চাইরটা, সগিলা, তামান

পরিমাণবাচক : ব্যাশি, ভাইল্‌লা, অ্যাতুলা, এত্তোকোনা

কালসূচক : অ্যালায়/অ্যালা, শ্যালায়/শ্যালা, স্যাখন/জ্যাখন

স্থানবাচক : এটে/এইটে, ওটে/ওইটে/ওইঠে, কোটে/কোনটে/কোন্‌ঠে/কুন্‌ঠে

পদ্ধতিজ্ঞাপক : অ্যাঙ্‌করি, ক্যাঙ্‌করি, অঙ্‌করি, ত্যাঙ্‌করি।

সম্মতি-অসম্মতি সূচক : হয়, হয় হয়, নোয়ায়/ নোমায়/ নোহায়, নহয়, উহ।

হেতুবাচক : কি, ক্যানে, কিবাদে, সেইবাদে।

যৌগিক-ক্রিয়া বিশেষণ : জ্যালায়-শ্যালায়, হিত্‌তি-হুত্‌তি, জিদি-সিদি

৪) ক্রিয়া ও ক্রিয়ার কাল ঃ

কামরূপীতে সংস্কৃত ও বাংলা ধাতুজাত ক্রিয়াপদই ব্যবহার করা হয়। শুধু কালগত প্রয়োগে এদের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

'ধর' ক্রিয়ার কালগত রূপ

(বর্তমান কাল)

পুরুষ	সাধারণ বর্তমান		ঘটমান বর্তমান		পুরাঘটিত বর্তমান	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম	(মুই) ধরঙ	(হামরা) ধরি	ধইরবার-ধরছঙ	ধইরবার ধরছি	ধইরছুঙ	ধইরছি
মধ্যম	(তুই) ধরিস	(তোমরা) ধরেন	ধইরবার ধরছিস	ধইরবার ধইরছেন	ধইরছিস	ধইরছেন
প্রথম	(উয়ায়) ধরে	(উমরা) ধরে	ধইরবার ধইরছে	ধইরবার ধইরছে	ধইরছে	ধইরছে

(অতীত কাল)

পুরুষ	সাধারণ অতীত		ঘটমান অতীত		পুরাঘটিত অতীত	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম	ধরনু/ধরলুঙ /ধরিনু	ধইরলোঙ/ধরিলি	ধরিবার ধইরছুলুঙ	ধরিবার ধইরছিলোঙ	ধরিছিলুঙ	ধরিছিলোঙ
মধ্যম	ধরলু/ধরিলু	ধইরলেন/ধরিলেন	ধরিবার ধইরছিলু	ধরিবার ধইরছিলেন	ধরিছিলু	ধরিছিলেন
প্রথম	ধইরলেক/ ধরিলেক	ধইরলেক/ধরিল ধরিলেক	ধরিবার ধইরছিলো	ধরিবার ধইরছিলো	ধরিছিলো	ধরিছিলো

(ভবিষ্যত কাল)

পুরুষ	সাধারণ ভবিষ্যত		ঘটমান ভবিষ্যত	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম	ধরিম	ধরিম	ধরিবার ধরিম	ধরিবার ধরিম
মধ্যম	ধরবু/ধরিবু	ধইরবেন	ধরিবার ধরিবু	ধরিবার ধরিবেন
প্রথম	ধরিবে/ ধইরবে	ধরিবে	ধরিবার ধরিবে	ধরিবার ধরিবে।

(বর্তমান অনুজ্ঞা)

পুরুষ	সাধারণ		ঘটমান		পুরাঘটিত	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মধ্যম	ধর	ধরেন	ধরির ধরিস	ধরির ধরেন/ ধরির ধরিবেন	ধরিস/ ধরিবু	ধরেন/ ধরিবেন
প্রথম	ধরুক	ধরুক				

(ভবিষ্যত অনুজ্ঞা)

পুরুষ	সাধারণ	
	একবচন	বহুবচন

মধ্যম	ধরিস/ধরেন	ধরেন/ধইরবেন
প্রথম	ধইরবে/ ধরিবে	ধইরবে/ধরিবে

ভবিষ্যৎ 'ধরতে হবে'-এর রূপ ঃ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মোর ধরা খাইবে/নাইগ্বে	আমরাগুলার ধরা খাইবে/নাইগ্বে
মধ্যম	তোমার ধরা খাইবে/নাইগ্বে	তোমরাগুলার ধরা খাইবে/নাইগ্বে
প্রথম	উমার ধরা খাইবে/নাইগ্বে	উমারগুলার ধরা খাইবে/নাইগ্বে।

শিষ্টবাংলায় বচন ক্রিয়াররূপকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু কামরূপীতে বচন ভেদে ক্রিয়াররূপ ভেদ ঘটে।

শিষ্টবাংলা	কামরূপী
আমি খাই	মুই খাঙ/খাওঁ
আমরা খাই	আমরা/হামরা খাই
তুমি খাও	তুই খাইস/খা
তোমরা খাও/ আপনারা খান	তোমরা খান

শিষ্ট বাংলায় যে পরিবেশে সম্বন্ধবাচক কর্তা ব্যবহৃত হয়, কামরূপীতে সেই পরিবেশে কর্মবাচক কর্তা ব্যবহৃত হয়।

শিষ্টবাংলা	কামরূপী
আমার খিদে পেয়েছে	মোক ভোক্ ধরিচে/নাগিচে
আমার ঘুম পেয়েছে	মোক নিন ধরিচে
এগুলি আপনাদের দেবো	এ্যাইলা তোমাক দিমু/দিম

পদ বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য

১) শিষ্ট বাংলায় বহুবচনাত্মক ও নির্দেশক প্রত্যয় বাক্যে সব সময়েই বিশেষ্যের পরে বসে। কিন্তু কামরূপীতে কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শিষ্ট বাংলা	কামরূপী
এই জিনিসগুলো ভালো	ইল্লা জিনিশ ভাল
এই বইটা কার?	এটা কাৱ বই।

২) শিষ্ট বাংলায় নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু কামরূপীতে সাধারণত নঞর্থক অব্যয়টিকে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসতে দেখা যায়। যেমন

আমি ভাত খাব না	মুই ভাত না খাঙ্
তুমি হাটে যাবে না।	তুই হাটোত্ না যাবু

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
আ-	ই	উ	ই	অ/আ	নি/আনি
ব্যাটা	ব্যাটি	কালটু	কালটি	নাউয়া	নাউয়ানি
বুরা	বুরি	মুতারু	মুতুরি	নালচিয়া	নালচিয়ানি

কামরূপী শব্দ ভাণ্ডার

শিষ্ট বাংলার মতো কামরূপীতেও শব্দ এসেছে প্রধানত তিনটি উৎস থেকে। সংস্কৃত, দেশী বিদেশী (ইংরেজী, আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ) এবং অন্যান্য যেমন বোড়ো, কোচ, রাভা ইত্যাদি।

সংস্কৃত ঃ

তৎসম : ধ্যান, দান, নিশা, বৈরাগি, ভাণ্ডো (ভাণ্ড)

তদ্ভব : আই (মা), আগিনা/এগিনা (উঠোন), গাভিন (গর্ভবতী)

অর্দ্ধতৎসম : অক্তো, থান, পরবাশ, বইশটোম, কেশটো।

দেশী : আচা (শুঁয়োপোকা), কশ্‌টিয়া (কৃপণ), টিকা (নিতম্ব) ঢাঙা (লম্বা), শাঙ্‌না (উপপতি)

বিদেশী ঃ

ইংরেজি—ডবোল, গিলাশ, পেছিডেন, এডিও, পিনচুল, ছিলোট

আরবী—জবাই, দুনিয়া, ফাজিল, আক্কেল।

ফারসী—আওয়াজ, আশকারা, কম্‌বক্‌তা, কাকা, জমি

পর্তুগীজ—মিশ্‌তিরি, বালটিঙ, আনারস, বয়াম

অন্যান্য ঃ

বোড়ো—আউ আউ (নানা), দলোঙ্‌ (সেতু), গ্যাদেরা (অপরিষ্কার), হাঙ্‌রা (বাঁশের বেড়া), হাফা (বনবিড়াল)

কোচ-রাভা—আঙশাঙ (উল্টোপাল্‌টা), দাগিলা (কাঁথা), কামিছাম (উদুখল), গাইন (মুষল, প্রহারক)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : ঠাঙাউ ঠাঙাউ (ধাতব আওয়াজ), টিকিস টিকিস (ব্যাথা অনুভব), হারাঙ হিরিঙ (পতনের আওয়াজ), চাটাউ চাটাউ (খড়ম বা তজ্জাতীয় শক্ত চপ্পলের আওয়াজ), ভকর ভকর (কথা বলার আওয়াজ) , খম্‌খম্‌া (জমাট বাঁধা)

কামরূপী উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বাংলাভাষার বিবর্তন ধারায় কামরূপীর অবস্থান মধ্য বাংলাস্তরে) "যেমন : সংস্কৃত অদ্য—প্রাকৃত অজ্জ—প্রাচীন ও মধ্যবাংলা আজি (কামরূপীতে রক্ষিত)—আইজ (অপিনিহিতি : বঙ্গালী)—আজ (রাঢ়ী); দৃক্ষিত—প্রা দেক্‌খিঅ—প্রা. বা. দেখিঅ—মঃ বা. দেখিআ, দেখি (কামরূপীতে রক্ষিত)— দেইখ্যা—(বঙ্গালী)— দেখে (রাঢ়ী) ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাঢ়ীর চেয়ে বঙ্গালীতে এবং বঙ্গালীর চেয়ে কামরূপীতেই প্রাচীনতর বাংলার বৈশিষ্ট্য- বেশি সংরক্ষিত হয়েছে।" ৪

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণে' ব্যবহৃত রাজবংশী ভাষা আসলে তিস্তাপারের ভাষা। অর্থাৎ পুবে ডায়না পশ্চিমে আপলচাঁদ মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র ঘটনার কেন্দ্রস্থল গাজোলডোবা। ব্যাপ্তি সারা জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুর এমন কি নীলফামারী পর্যন্ত। তিস্তাপুরাণের ঘটনার কেন্দ্রস্থল ধূপগুড়ি ব্লকের দলগাঁও-সরুগাঁও। এর বিস্তার-জলপাইগুড়ি জেলা—উত্তরবঙ্গ। উভয় উপন্যাসেই লেখক জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী ভাষাকেই প্রধানত আদল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

রাজনীতি করার সুবাদে জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামান্তরে বহুদিন ঘুরে বেড়ানোর তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন। সেজন্য রাজবংশী-জীবনের আদ্যন্ত-খুব কাছে থেকে, বলা ভালো মিশে গিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাই উভয়গ্রন্থে রাজবংশী জীবনের খুঁটিনাটি যেমন তিনি অনুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেছেন তেমনি তার মধ্যে দেখা যায় ভাষারও অনুপুঙ্খতা। অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ শব্দ, বাক্যও তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সময়ের প্রবাহে যেসব শব্দ রাজবংশী জীবন থেকেও হারিয়ে যাচ্ছে, সেই শব্দগুলিকেও তিনি খুঁজে বের করে সার্থক

প্রায়োগ করেছেন। আবার রাজবংশী ভাষায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইংরেজি শব্দ, শিষ্ট বাংলা শব্দ। চরিত্র বুঝে ভাষার পার্থক্যও রক্ষিত হয়েছে। বাঘারুর বাচন ও রাজবংশী এম.এল.এ-র বাচন এক রকম রাজবংশী ভাষা নয়। গয়ানাথ ও পঞ্চানন মল্লিকের বক্তব্যের মধ্যেও তফাৎ আছে। তিস্তাপুরাণে রাজবংশী চরিত্রগুলি প্রায় সমগোত্রীয় তাই তাদের বাচনে তেমন কোনো তফাৎ পরিলক্ষিত হয় না। তবে ছোটদাদা দীর্ঘদিন বাইরে নির্বাসনে থেকে বা বুড়িমার গোত হাতি ডোবা দেখার জন্য বার্ণেশ এলাকায় কয়েকদিন থাকার ফলে বহু মানুষের সঙ্গে মেশার ফলে কিছু নতুন শব্দ ব্যবহার করতে শিখেছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে রাজবংশী ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনের সময় দেবেশ রায় বলেছেন—

"আমি রাজবংশী ভাষা রাজনীতির প্রয়োজনে শিখেছি। যখন শিখলাম একবারও ইচ্ছে হয়নি ঐ রাজবংশী ভাষায় আঞ্চলিক গল্প লিখব। আমার মনে হয়েছিল ঐ রকম আঞ্চলিক লেখালেখির দরকার নেই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প এগোচ্ছে হঠাৎ একটা রাজবংশী সংলাপ এসে গেল, সেখানে গল্পটার আখ্যান ভাগ একটা অন্য অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সেখান থেকে আবার বর্ণনার ভাষায় চলে আসতে পারছি। আখ্যানটাকে দু-তিনটে স্তরে কাজ করানো যাচ্ছে।..........'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' পুজোর জন্য লেখা শুরু করি এবং গল্পটা ক্রমশ বড় হতে থাকে, বড় হতে থাকে, আমি বাধা দিই না। এখানে একটা রাজবংশী চরিত্র এলো, অথচ এটা রাজবংশী জীবনের গল্প নয়। সেই বৃদ্ধের সংলাপে বুঝতে পারলাম গল্পটা দু-তিনটে স্তরে ঘোরাফেরা করতে পারছে।' 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' লিখতে গিয়ে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার আধুনিক উপন্যাসে আখ্যানকে কীভাবে বদলে দিতে পারে এইটি হাতে কলমে জানতে পারলাম ঐ ভাষা ব্যবহারের পর। লেখার পর মনে হল—এখানেই আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক প্রয়োগ ঘটতে পারে ও আঞ্চলিক ভাষা তার বাচনের অশ্রুতপূর্বতা ও অজ্ঞাত পূর্বতার মোহ ভেঙ্গে ফেলে আখ্যানের অপরিহার্য অংশ হতে পারে। গল্প লেখার বাংলা আর আঞ্চলিক বাংলা পরিপূরক হতে পারে।.........এর আগে পর্যন্ত যে সব উপন্যাস লিখেছি; 'মানুষ খুন করে কেন'; 'যযাতি'; তাতে আখ্যানের এই অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। সেখানে বাঁধা ছকের ভেতরই কাজ করেছি। কিন্তু আখ্যানের ধরন যে বদলে যেতে পারে, দু-তিনটি স্তরে আখ্যানকে ছড়িয়ে দেখা যায় এটা আমি শিখেছি রাজবংশী ভাষা শেখার পর, রাজবংশীদের মধ্যে পার্টির কাজ করতে করতে; রাজবংশী বাচন থেকে।" ৫

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে রাজবংশী ভাষার ব্যবহার নিয়ে কয়েকটি বিষয় আমরা জানতে পারছি—

ক) আঞ্চলিক গল্প লেখার উদ্দেশ্যে রাজবংশী ভাষার ব্যবহার নয়।

খ) আধুনিক উপন্যাসের আখ্যানকে বদলে দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার।

গ) স্বাভাবিক গদ্যে লিখিত গল্পে রাজবংশী সংলাপ প্রয়োগে গল্পটা দু-তিনটি স্তরে ঘোরাফেরা করতে পারে।

(ঘ) আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক প্রয়োগে আঞ্চলিক ভাষা তার অশ্রুতপূর্বতা ও অজ্ঞাত পূর্বতার মোহ ভেঙ্গে ফেলে আখ্যানের অপরিহার্য অংশ হতে পারে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' এর গঠনরীতি ও ভাষারীতি অনুধাবন করলে লেখকের এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রথমেই বলা যায় যে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' বাংলা ভাষায় রচিত অন্যান্য আঞ্চলিক উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম, গঙ্গা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ইত্যাদি'র মতো আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। পটভূমি হিসেবে তিস্তাপার, ভাষা হিসেবে রাজবংশীভাষা, এবং জনগোষ্ঠী হিসেবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবন বৃত্তান্ত হয়েও এর সর্বজনীন রূপ ও রীতির জন্য এ 'মহাকাব্যোপম আধুনিক উপন্যাস।

স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প চলছে তাতে রাজবংশী চরিত্রের প্রবেশ, তাদের সংলাপ কী ভাবে গল্প বা আখ্যানটিকে দু-তিনস্তরে ছড়াতে পারে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হলো—

'তখন কি জোতদারনী জানে যে ওর পেটে পেটে এত বুদ্ধি। তবে ও এতটা সাহস করত না যদি তার স্বামীর মৃত্যুর পর পাশাপাশি যেসব জোতদার-জোতদারনীর জমি নিতে চেয়েছিল দেখা শোনার অছিলায়, তারা তাকে উশ্‌কে না থাকে। ওর যদি দল থাকত তা হলে তারা তো আসত। তারা কেউ আসে নি।

' সেইখান গেইছে কোটত?' বিসারু জিজ্ঞাসা করে।

'ঘরত বসি আছে।' ধোলীই জবাব দেয়।

একটু অবাক হয়েই দুখারু বলে, 'কার ঘরত?'

'ওর নিজের ঘরত'। কলেশ্বরী বলে

'ঝান্ডাখান টাঙি দিয়া ঘরত বসি বসি জমি দখল? স্যালায় অ্যানং গোলমাল য্যান রাজ্যপাট যাবা বসিছে, ধানক্ষেতত আগুন?' দুখারু নিজের বিরক্তি জানিয়ে দেয়, 'আসিবার কও কেনে।'

ধোলী ও কলেশ্বরী জলের ঘটি দুটো নিয়ে চলে যাওয়ার পরও তার শালাকে নিয়ে আধিয়ার আসার আগে

বিসারু বলে- 'মনত খায় কী ঐ শিলশিলা জোতদার উমরাক কহিছে, 'তুই ঝান্ডা গাড়ি দে, পাছত যাম। হামরালা আসি গেছি বাদে আর না আসে।' এই যুক্তিটাই ঠিক মনে হয় লোকটিকে কেউ তাতিয়েছে ও তারা সময় মত আসে নি। বুড়িমার গোত না এলে ও বেলা আর একটু বাড়লে, তারা আসত। বিসারুই আবার বলে, 'চারি পুখে জমি দখল। কে জানে বাপো কায় কাক তাতাছে? জমি চুরি য্যানং আছে, দখল চুরিও স্যানং হচ্ছে।' ....এই নতুন আধিয়ারের পেছনে পেছনে আরো চারজন এসে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটি বাচ্চা তাদের পেছনে।

তাদেরই একজনকে দুখারু বলে, 'ই ক্যানং কথা টটেশ্বর। তোমরালা অ্যানং পুরানা মানষি, জোতদারের কালঠে আধিয়ার, তোমরালার জমিত এ্যানং গোলমাল?' টটেশ্বর বলে ওঠে। 'হামরালা এই সবের পাকে নাই। হামরালা গিরিনিক-কহিছু, হামরালা ওর পাকে নাই। উমরায় যা বোঝে গিরিনীর নখত বুঝুক।'

নতুন আধিয়ারকে বিসারু বলে, 'যা কেনে, তোর ঝান্ডা খুলি-তোর-ঘরঠে-রাখি দে।' সে যেন এই কথাটুকুর জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। একা একা গিয়ে কঞ্চি সহ ঝান্ডাটা তুলে আনে, দাঁড়াবে কীনা বুঝতে পারে না। তার শালা সবে বলতে শুরু করেছে, 'ওর কথাখান শুনিলেন না আপনোঁ। জমি যদি খাস হয় তো উমরার তো একখানি দখল নতুন সরকারের আইনে থাকিবারই কথা।'

বিসারু বলে, "তোমরালা সাগাই আসিছেন, সাগাইখান। মোর এইঠে ঝামেলা পাকিবেন না।" ৬

এই অংশে গল্পটি হলো—ধরণী জোতদারনীর নতুন আধিয়ার জোতদারনীর জমিতে লালঝান্ডা পুঁতে দখল নিয়েছে তার শিলিগুড়ি থেকে আসা এক শালার পরামর্শে। এদিকে বুড়িমার জোতের লোকজন তাদের জমি দখল হয়েছে ভেবে ছুটে এসেছে। অনুমান করা হয় শিলশিলা জোতদার এর পেছনে রয়েছে। সব ভুল বোঝাবুঝি ও ঝামেলার পর—নতুন আধিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবার সেই ঝান্ডা গাড়া নিয়েই বুড়িমার জোতের লোকজন, নতুন আধিয়ার, তার শালা, নতুন আধিয়ারের সঙ্গের লোকজন এদের মধ্যে কথোপকথন। কথোপকথনের ভাষা রাজবংশী। চরিত্রগুলো সবাই রাজবংশী। এই কথোপকথনের মাধ্যমে রাজবংশী মানুষের অনুভূতি সঠিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কথোপকথনের রাজবংশী ভাষা লেখকের বাংলা বাচনের অনুবাদ নয়, চরিত্রগুলির নিজেদেরই অনুভবের কথা। যেমন—'বিসারু বলে—মনতখায় কী ঐ শিলশিলা জোতদার উমরাক কহিছে, তুই ঝান্ডা গাড়ি দে, পাছত যাম। হামরালা আসি গেছি বাদে আর না আসে।' শিলশিলা জোতদার সম্পর্কে বিসারুর এই বিশ্বাসযোগ্য অনুমান রাজবংশী ভাষা ছাড়া ফুটে উঠত না।

শালা সবে বলতে শুরু করেছে। 'ওর কথাখান শুনিলেন না আপনোঁ। জমি যদি খাশ হয় তো উমরার তো একখান দখল নতুন সরকারের আইনে থাকিবারই কথা।' শালার এই উক্তি বহুস্বরিক। শালার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এখানে আমরা লেখকের কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছি।

রাজবংশী বাচনের সংলাপগুলি এতটাই বাস্তব সম্মত যে বক্তব্য শুধু শ্রুতিগ্রাহ্যই থাকে নি, হয়েছে দৃশ্যও

'টটেশ্বর বলে ওঠে, 'হামরালা এই সবের পাকে নাই। হামরালা গিরিনিক কহিছু, হামরালা ওর পাকে নাই। উমরায় যা বোঝে গিরিনিক নখত বুঝুক।'

নতুন আধিয়ারের সঙ্গী টটেশ্বর অবস্থা বুঝে তার সুর পাল্টে ফেলে। তার রাজবংশী বাচনে আছে নাটকীয়তা। সুতরাং বক্তব্যের বাস্তবতা, স্পষ্টতা, বহুস্বরিক ও নাটকীয়তা এসব বহু স্তরে বিষয়কে বিন্যস্ত করা গেল রাজবংশী বাচনের জন্যই। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তো এরকম উদাহরণের ছড়াছড়ি। বর্ণনার স্বাভাবিক গদ্যে রাজবংশী শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের ব্যবহার বাচনে অশ্রুতপূর্বতা নিয়ে এসেছে। বক্তব্যের অর্থ অধিকতর স্পষ্ট ও তাৎপর্য পূর্ণ হয়েছে। যেমন (১) "বাঘারু যখন নিশ্চিন্ত হয় যে তার দুই হাতের মুঠোর ভেতর বাছুরের ঐ একটুখানি মাথা পুরো সেঁটে আছে সে তখন ধীরে ধীরে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে বাছুরটাকে টানে। বাঘারুর যেন হিসেব আছে, কখন, কতধীরে, আর কখন, কত তাড়াতাড়ি টানলে, পেটের ভেতরের আস্ত একখান বাছুর জলে রক্তে ভিজি বাহির হয়্যা আসি দুই ঠ্যাঙত খাড়া হবার পারে।" ৭

(২) "বুড়িমা তাহলে এই বুড়িমার জোতের কারো আবোর আবোর আবো, কারো হয়ত মাও, হয়েও, সকলেরই সব বেটাছোয়া-বেটিছোয়ার, সব বুড়ার সব ছোয়ার, পেটের ভিতরের সন্তান? সে-সন্তানটাকে দেখোঁ নাই কিন্তু সেই সন্তানখান প্যাটের ভিতরত্ গুঁতা মারে, ঘোরে, চক্কর দেয়।" ৮

রাজবংশী ভাষা, বর্ণনার ভাষা হিসেবেও ব্যবহার করার উদাহরণ উপন্যাস দুখানিতে পাওয়া যায়। যেমন— (১) "কুন অং(রং) কুখন ফুটে উঠে আর মিলি যায়, না দেখা যায়, না বোঝা যায়। চক্ষুর পলকখান একবারে ফেলিবার মধ্যে আকাশখান আর এক ঝলক বদলি গিছে।' আগুনের নাখান অংটা দূরত-দূরত চলি যাচ্ছে, দু-ই পছিম পাখত তিস্তা নদীর পারত, তার পচিমে জলপাইগুড়ি সদরত, তার পচিমে কোটত কোটত আজ গঞ্জ—সবখানের আকাশ নাল (লাল) টকটকা হবা ধরিছে হে। এ্যালায় কুমলাইয়ের পুবত অংখান পাতলা হবা ধরিছে। কায় য্যান ঐ লাল অংটা ধুইবার-ধইচচে। আর-হু-ই তিস্তাপারের পচিম পাখ তক পাতলা হয়্যা যাছে। কোটত আলো কোটত যায়।" ৯

(২) "নাই রো, নাই রো। এইখান কি তোমার ফৌজদারি মামলা যে সাক্ষীক জেরা করিবেন? সব জিনিষের কি প্রমাণ হয়? সাক্ষী হয়? না হয়, না হয়। এইলা ভাদুরা রোদত পাহাড়ের কুন একখাড়ির মাথাত্ যে এক মহাবানা ঝুলি আছে, তার কি কুনো সাক্ষী থাকিবা পারে? প্রমাণ থাকিবা পারে? না পারো, না পারো। বুড়িমাক চোখের পাতা খুলিবার কেহ দেখো নাই। চক্ষুমুদি যে-বানা দেখিবার নাগে আর যে-বানা এক বুড়িমাই দেখিবার পারে। সে বানার সাক্ষী হয়? প্রমাণ হয়? বুড়িমা যখন কহি দিছে, স্যালায় বুড়িমা দেখিবা পাছে।" ১০

উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু রাজবংশী শব্দের বাংলা অর্থ সহ তালিকা দেওয়া হলো।

তিস্তাপুরাণ ঃ অ্যালং প্যালং (আজেবাজে), গলগলা (অধিক বয়সী), গুলগুলা (গলগলার সমার্থক), তাংকু (তামাক), ধোকর (পাতান বা সম্পর্কিত), ঢ্যানা (অবিবাহিত পুরুষ), ফিচকিলি (ধাঁধা জাতীয়), গিলাপ (চাদর বা কম্বল), ধকরা (চটের তৈরি মোটা ফরাস), ঢক (সৌন্দর্য), আয়ী (মা), গোঠো (একত্রিত, ছইনচা (দু'ঘরের মাঝখানের সরু জায়গা), এগিনা (উঠান), সোলংগা (ছোট নৌকা)।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ঃ হলহলা (সবুজ বা সতেজ), হায় হায় পাথার (ধু ধু মাঠ), সলসল (সোজা-লম্বা), সানজি (দু'আঙুলের মাঝখানের ফাঁক), নিদুয়া (ঘুমকাতুরে), কাছারপাড়ি (বিরাট স্ত্রী মোষ), ওই কিয়া (একা) , ওয়ালিপাড়া (মরদ মোষ), অরনা (বুনো মরদ মোষ), দোমচা (অরনার ঔরসজাত মোষশাবক), কোশল (হরতকি), গর্জালবাড়ি (বর্ষার ঘাস জঙ্গল), খোপ (ঘন ঘাসের জঙ্গল), কিলকানি (কনুই)।

"তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর রাজবংশী বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। সুখবিলাস বর্মা 'তিস্তাপারের অস্থির (?) বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে— 'রাজবংশী ভাষার ডায়লগের কী অবস্থা', বলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সংলাপ উদ্ধৃত করে ভাষা ব্যবহারের নানা ত্রুটি উল্লেখ করেছেন।

'কিন্তু কথাটা হইল, মোদের এই ক্রান্তি হাটত কুনো বাইরের পার্টি, সে সরকারের হবা পারে আবার ধরেন কেনে প্রাইভেট পার্টিও হবা পারে, যে কুনোদিন এমন হয় নাই যে তারা নিজেরা রান্না করিবার ধরিসে। এতো মোদের একখানা সুনাম দুর্নামের বিষয়।'

"রাজবংশী কথ্য ভাষার নিরিখে বিচার করলে এই ডায়ালগে যে ভুলগুলো জ্বলজ্বল করছে তাহল—কিন্তু, আবার, তারা, নিজেরা, একখানা, বিষয় যে কথাগুলো হওয়া উচিত যথাক্রমে কিন্তুক, আর, উমরা, নিজে নিজে, অ্যাখ্যান বা অ্যাকটা, ব্যাপার। এই কথাগুলি ঐ ভাবে না বললে রাজবংশী ডায়ালগ হয় না। কিন্তু

গুরুচন্ডালী দোষের ভুল রয়েছে মোদের কথাটির ব্যবহারে। 'আমাদের সর্বনামের রাজবংশী কথা 'আমার/হামার/আমারলার/আমারগুলার ইত্যাদি।........উমরাক এবং কোটত এই দুটি শব্দ উপন্যাসে বহুল ব্যবহৃত যা দেখিয়ে দেয় যে এই ভাষার ব্যাকরণ ও কথ্যরূপ সম্পর্কে লেখকের প্রাথমিক জ্ঞান নেই। 'তিনি/উনি' এই সর্বনামের রাজবংশী কথা 'উমরা', কিন্তু তাকের রাজবংশী রূপ 'উমরাক' নয় 'উমাক'। 'কোথায়' এই স্থান সূচক অধিকরণের রাজবংশী শব্দ 'কোটে'/ কোন্ঠে/ কোঠে/ কুঠে ইত্যাদি 'কোটত' নয়। রাজবংশী ব্যাকরণে অধিকরণে সপ্তমীর 'এ' স্থানে 'ত' হয় এই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেই বোধ হয় তিনি 'কোটত' ব্যবহার করেছেন। হায়রে অদৃষ্ট।"১১ শব্দ প্রয়োগের এমন ভুলের কথা ধরলে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে এরকম অসংখ্য ভুলের সন্ধান পাওয়া যাবে। যেমন-তিস্তাপুরাণে—

(১) 'তিস্তা স্যানং বড়-অ্যানং চওড়া।'

শুদ্ধ রাজবংশীতে হবে—'তিস্তা য্যানং বড় স্যানং চওড়া।'

(২) 'আরো পশ্চিমত ডায়না নদীখান দিয়া নামিবার নিতাম'

এখানে নিতামের স্থানে হবে—'ধরনু হয়/ধরনুং হয়/ ধইন্য হয়।'

(৩) 'আর জল ঢাকা থিক্যা পুবে।'

এখানে 'থিক্যা' স্থানে হবে 'থাকি'।

(৪) মোরা সোলংগাখান করি-নদীখান নদীখান দিয়া তিস্তা যাই।

এখানে 'মোরা' না হয়ে হবে 'আমরা'/হামরা'।

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে—

(১) উমরার শুকনা মালগাড়ি ত এখন মালস্টেশনে আসে।

এখানে 'উমরার' না হয়ে হবে উমার/ওমার।

(২) 'না, এমনিই ধরেন, হামরালা ত তিস্তার পুব পাখে খাড়ি আছি, আমাদের পাছত, মানে ধরেন কিনা আরো উত্তরে আর পুবে চালসা, হায় হায় পাথার।' এখানে 'আমাদের' না হয়ে হবে আমরালার/হামরালার।

(৩) 'তুই থাকি যা না আজিকার রাতটা, এইঠে, বাথান নিয়ে, কাঠ পাহারা দিবু। পাইসা পাবু।'

এখানে 'রাতটা' স্থানে হবে 'রাতিটা'/'আতিটা'। 'নিয়ে' স্থানে হবে 'নিয়া'

(৪) দেখিবার নাগে ঐঠে কি সত্যিই একখান নতুন নদী বানিবার ধরিছে, নাকি; ময়নাগুড়ির ঐ

বেটিছোয়াখানের নাখান নাচানাচি নাগাবার ধরিছে।'

এখানে 'সত্যিই' না হয়ে হবে 'সচায়'/হাচায়।

(৫) 'আচ্ছা, আচ্ছা মুই এইঠে আসিছু, যাবি ত মাই?

এখানে 'যাবি' না হয়ে হবে 'যাবু'।

'কোথায়' অর্থে 'কোটত' শব্দটি নিয়ে বড় আপত্তি তোলা হয়েছে। 'কোটত' শব্দটি তিস্তাপারের বৃত্তান্তে মোট ৫৫বার এবং তিস্তাপুরাণে মোট ১৪৪ বার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে—

(১) তোমাক কোটত হাল দিবার কহিবে?

(২) কোটত স্যায় শেয়ালখাগের বেটা, শালো ছাগির ছোয়া।

(৩) কোটত, কোটত, ভুরুর ওপর হাতের ঢাকা দিয়ে অনেকে চেষ্টা করে।

(৪) কোটত মাথা আর কোটত ল্যাজ।

(৫) তার আগত মোর নামখান আর আসিবে কোটত? ইত্যাদি—

তিস্তাপুরাণে—

(১) কোটত তোর ইংজারি?

(২) কোটত, আগুন জুটিবে কোটত?

(৩) মা-জননী কোটত আসিলেন, কোটত যাছেন......তিস্তা বুড়িমা কোটত আসিলেন, কোটত যাছেন?

(৪) তিস্তাকে কি জিজ্ঞাসা করা যায় কোটত আসিলেন আর কোটত যাছেন?

(৫) রো রো রো, মোক ছাড়ি কোটত যাছেন? ইত্যাদি।

রাজবংশী বাচনে 'কোটত' শব্দটির ব্যবহার উত্তরবঙ্গের কোনো অঞ্চলেই নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে শব্দটি লেখক তৈরি করেছেন ঘরোত, বাড়িত, ঘাটোত, বগলত ইত্যাদি অধিকরণে 'ত' বিভক্তি যোগে গঠিত শব্দগুলির অনুকরণে। 'কোথায়' অর্থে রাজবংশীতে 'কোটে', কোনঠে, কুনঠে শব্দগুলি অঞ্চল ভেদে ব্যবহার করা হয়। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণেও কয়েকটি স্থানে তিনি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।

যেমন — তিস্তাপারের বৃত্তান্তে—

(১) না, না এখানে শুকনা লঙ্কা হয় কোটে?

(২) মানষিলা তো মোক বাঘারু নাম দিয়াই খালাস, কিন্তু মুই লাগাম কুনঠে?

(৩) তা তোর নামখান শেষ হইল কুনঠে?

(৪) মা না থাকিলে মুই আসিম কুন্ঠে?

(৫) গয়ানাথ এই ফ্লাডের নদীর ভেতর কোনঠে মোক খুঁজিবার পাবে হে?

'কোটে' একবার, 'কুনঠে' তিনবার ও কোন্ঠে একবার ব্যবহৃত হয়েছে।

তিস্তাপুরাণে—

(১) কোটে রাখিবেন ঐলা বস্তা?

(২)হাঁচিবার ধরিছেন আর কোন্ঠে কুন নদীতে একোখান সোলংগা দেখিলেন কী দেখিলেন না, স্যালায় ঘাটোয়াল, ঘাটোয়াল বলি ডাক পাড়িবার ধরিছেন?

(৩) ঘাটোয়াল লগিটা জলে ফেলতে ফেলতে, নিজেকেই বা পাইকারকে জিজ্ঞাসা করে যাম কোন্ঠে?

(৪) দোলানই একবার বলে ওঠে 'বেটিছোয়াগিলা কুনঠে' গেইল?

এখানে একবার 'কোটে', দু'বার 'কোন্ঠে' ও একবার 'কুনঠে' ব্যবহার করা হয়েছে।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের আগে রচিত 'মফস্বলি বৃত্তান্তেও 'কোন্টে' ও 'কোন্ঠে' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

(১) বৈশাখু সোজা হয়, 'চল কেনে, একদম মাছ নাই, আর কোন্টে পোয়া যায়?

(২) বেঙ্গু চিলের মতন চিৎকার করে ওঠে 'মা কুনঠে চাউল পাবে?

(৩) ধুত্ আর দেরি কুন্ঠে, অ্যালায় বেলা দুপ্পর হসে এর বাদে বেলা নামিবার ধরিবে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে দেবেশ রায় - 'কোথায়' অর্থে কোটে, কোন্ঠে, কোন্টে বা কুন্ঠে'র ব্যবহার জানেন না বলে 'কোটত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা ঠিক নয়।

আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি আঞ্চলিক ভাষায় একটি আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যে লেখক 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বা 'তিস্তাপুরাণ' লেখেননি। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার—আখ্যানকে নানাস্তরে নানা অর্থে পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে। সেজন্য রাজবংশী ভাষার চলিষ্ণুতার দিকে তাঁর যত লক্ষ বিশুদ্ধতার দিকে তত নয়। এ প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি প্রণিধান যোগ্য। "কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ভাষা

আদৌ নিরেট বা নিশ্চল নয়, নেহাত অলংকরণ নয়। তেমন ঘটলে উত্তরবাংলার এলাকাটি পরিণত হত স্থানু জগতে, আর পাঠক, সেই ভূখন্ডের শৌখিন পর্যটকে; ...... কিন্তু এ উপন্যাস তার কাছ থেকে দাবি করে সক্রিয় শরিকানা, টেনে আনে উদ্দিষ্ট পাঠককে ইতিহাসের মধ্যে। সে ইতিহাসের টানেই তিস্তাপারের কোনো ভাষার, বাংলা হোক বা রাজবংশী, সুস্থিত আদলই নেই।" ১২

আঞ্চলিক ইতিহাস ধরবার জন্য, অঞ্চলের মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রনের জন্য লেখককে প্রয়োজন মত ভাষার অদলবদল বা নবরূপ নির্মাণও করতে হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার নিয়ে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছেন—"ডায়ালগ নতুন করে তৈরি করতে হয়। আমি সেই ডায়ালগটাই দেব যাতে মনে হবে যেন একটা লোকাল কালার আছে; কিন্তু কোনো লোকালিটি নয়— সেটা সর্বজন বোধ্য হবে।" ১৩

আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো তিস্তাপুরাণের ক্ষেত্রেও খাটে। সেখানেও রাজবংশী ভাষার চলিষ্ণু দিকটির প্রতিই লেখকের নজর। সেখানেও আঞ্চলিক ভাষার 'খরশান', লোকায়তিক 'পৌরুষ'। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'-এর ভাষা রীতি আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তাঁর রচনা রীতি যেমন বিচিত্র ও অভিনব, ভাষা-রীতিও তেমনি অভিনবত্ব দাবি করে। ভাষা যেমন বিষয়ানুগ তেমনি যেন নিজেই একটা বিষয় হিসেবে হাজির হয়েছে। পদ বিন্যাসের নানা ধরন ভাষায় শুধু বৈচিত্র্যই আনেনি এনেছে বাক সুষমা, বাক্য গঠনের নতুন ভঙ্গি। ঘটমান অতীতকালের 'করছিল' 'দেখছিল' নিত্যবৃত্ত অতীতের 'করতেন', 'দেখত' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন বাক্যগুলিতে অতীতের ঘটে যাওয়া কাজের বিবরণ দেওয়ার সুবিধা যেমন তিনি নিয়েছেন তেমনি ঘটমান ভবিষ্যতের দেখতে থাকার, করতে থাকার সুবিধাও নিয়েছেন। অনুজ্ঞাবাচক বর্তমান-এ 'হাটুক, হাটুক, হাটুক' ক্রিয়াপদের ব্যবহার বৃত্তান্তের চলমানতার ইঙ্গিতবাহী। কথা বিস্তারে, কথান্তরে ও অনুপুঙ্খ বর্ণনায় অতীত ও ভবিষ্যতকালের ব্যবহার দুটি উপন্যাসকেই মহাকাব্যিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

"আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর— সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মত। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে কোনোটাকে কমাতে; কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।" ১৪

উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন, গ্রহণ, বর্জন, বাড়ানো, কমানো সব কাজটাই নির্ভর করে ভাষার ওপর। দেবেশ

রায় তাঁর নিজস্ব ভাষার ভঙ্গিতে বা ভাষারীতিতে সে কাজ সম্পন্ন করেছেন। এভাবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে লেখকের বর্ণনায় চরিত্রের সংলাপে, বহু মানুষের আঞ্চলিক কথোপকথনে হয়ে উঠেছে বহুস্বরিক দুই নব পুরাণ।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র ভাষারীতি

সময়ের দিক থেকে বিচার করলে উপন্যাস সাহিত্য শাখায় একেবারেই অবচিন। এই অর্বাচীনতার কারণে উপন্যাস সাহিত্যের অন্যান্য শাখা — কবিতা, নাটক ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন এবং সর্বাধিক শোষণ ক্ষমতাযুক্ত। অন্যান্য শাখা গুলি যেমন নানা বিধি নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, উপন্যাস তা নয়। সে অনায়াসে সকল সাহিত্য শাখার বিবিধ উপকরণ, আত্মস্যাৎ করে নিজের রূপ তৈরি করে নিতে পারে। সে জন্য আজ পর্যন্ত উপন্যাসের তেমন কোন আর্টফরম গড়ে উঠতে পারেনি। উপন্যাসের আবেদন সম্পর্কে মার্ক স্কোরার বলেছেন—" as Though it were not at all but an immediate transcript of life, a journalistic form of history,"১৫ চারপাশের পরিচিত জীবন যেমন উপন্যাসের আবেদন অনেকটা তারই অনুরূপ।

বহু বিচিত্র জীবনের কথা বলা উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষারীতিও বহু বিচিত্র হবে এটাই স্বাভাবিক। উপন্যাসের ভাষা গদ্য। কিন্তু কাব্য, নাটক, ও অন্যান্য আঙ্গিকের ভাষা রীতিও উপন্যাসের ভাষার লক্ষ হয়ে যায়। সুতরাং উপন্যাসের মত উপন্যাসের ভাষারীতিরও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপন করা সম্ভব নয়। বরং বলা যেতে পারে উপন্যাসের গদ্যরীতির সঙ্গে এ এক বেগবান প্রবাহ।

উপন্যাসের যে বিভিন্ন প্রকরণগত উপাদান আছে যেমন কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ, ভাষা ইত্যাদি — এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভাষা। কারণ সব উপাদানই সরব ও সজীব হয়ে ওঠে ভাষার মাধ্যমে। উপন্যাসের কেবল বহিরঙ্গ নির্মাণই ভাষার কাজ নয়, তার অতিরিক্ত আরও গভীর তাৎপর্য পূর্ণ কোনো কিছুর সংযোজন ঘটে এই ভাষার মাধ্যমে। সে জন্য বলা হয়েছে—" Language like clay or print, is a transfiguring material, not a lens, through which the artist projects his vision" ১৬

ভাষারীতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক অনিল কুমার সেনগুপ্ত প্রায় অনুরূপ একটি মন্তব্য করেছেন। "প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের প্রকাশ ভঙ্গি বা ভাষারীতির মধ্যে স্রষ্টা-শিল্পীর ব্যক্তিত্বই পরিস্ফুট

হয়ে ওঠে। ....শিল্পীর যে বিশিষ্ট 'মুড' থেকে সেই উপন্যাসের জন্ম, সেই বিশিষ্ট মুডের সঙ্গে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর যেমন নিবিড় সম্বন্ধ, তার প্রকাশ ভঙ্গির সঙ্গে সমন্বয়ের নিবিড়তা ততখানি। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে বর্ণনার ভাষা বিষয়বস্তুর 'অনুগত' নয় 'সহগামী'। বর্ণনা, বিশ্লেষণ, বাক্য প্রয়োগ, শব্দ নির্বাচন, চিত্রকল্প রচনা সকল কিছুই সে ক্ষেত্রে শিল্পী মানসের সেই মুডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বর্ণনীয় বিষয়ের রস সার্থকতা সম্পাদনা করে। তার ফলে প্রত্যেকটি সার্থক সৃষ্ট উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ভাষারীতির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে।" ১৭

এ উপন্যাসের ভাষা শুধু বক্তব্য প্রকাশের বাহন নয়, স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত। উপন্যাসটি যুগপৎ বাংলা ও রাজবংশী ভাষায় রচিত। বাংলার মধ্যেও মাঝে মধ্যে এসেছে ওপার বাংলার বাচন রীতি। লেখকের বর্ণনার ভাষা, চরিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাষা ও সংলাপের ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে।

বর্ণনার শিষ্ট বাংলায় কখনো অনায়াসে ঢুকে পড়েছে রাজবংশী শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ। আবার রাজবংশী বাচনে শিষ্ট শব্দের ব্যবহার। যেমন বর্ণনার শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী শব্দ —"বাসে হাইওয়েতে নেমে, বাসের মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে রিক্সায়— রিক্সায় কয়েক মাইল দূরের হাটে যাওয়ার সুবিধে। কিন্তু যারা দক্ষিণে চক মৌলানি বা উত্তরে সেই হায় হায় পাথার থেকে টাড়ি বাড়ি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, নদীনালা পেরিয়ে বাঁকে বা মাথায় বোঝা নিয়ে, গরু ছাগল তাড়িয়ে তাড়িয়ে রাস্তা ছোট করতে করতে আসে। তাদের আর এই পাকা রাস্তা টুকুতে রিক্সার দরকারটা কী?" ১৮

'হায় হায় পাথার' ও ' টাড়ি বাড়ি' শব্দ দুটি রাজবংশী শব্দ। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র ভাষারীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ভাষার প্রবাহমানতা। তিস্তার জল প্রবাহের মতোই এর ভাষা গতিশীল। সে জন্য কোথাও কোথাও একের পর এক সরল বাক্য কোনো সংযোজক অব্যয় ছাড়াই বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাতে বাক্য হয়েছে আকারে বড়। কিন্তু ',' কমা দিয়ে দিয়ে সরল বাক্য গুলির সংযুক্তি ভাষায় এনেছে প্রবাহমানতা।

"সেই তরুণ শালতরুর শেকড়ের ওপর পা রেখে গয়ানাথ তার জামাইকে আদেশ দেয় — ' ভটভটি খান নিগি যা, টর্চ আনিবু, তোর বড় টর্চ খান, বাঘারুক আনিবু, ভাল একখান কুড়ালিয়া আনিবু, নাইলনের দড়ি আনিবু, এক বান্ডিল কি দুই বাণ্ডিল, মোটা নাইলন,' — তিস্তার দিকে তাকিয়ে গয়ানাথ তার একটা আন্দাজ দেয়, দুই হাতের আঙ্গুল গুলো দিয়েই আন্দাজ দেয়।" ১৯

এরকম প্রবাহমানতার আর একটি কৌশল ছোট ছোট সরল বাক্য দ্বারা বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা। সেরকম

দৃষ্টান্তও তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বিস্তর।

ক) " হলকা ক্যাম্প। সেটেলমেন্টের। এই জমি জমা মাপা মাপি হবে। কোন জমি কার এই সব। তার ওপর কোন জমিতে কে চাষ করছে সে সব রেকর্ড হবে।" ২০

খ) "বাঘারু নদীতে নামে। পায়ের গোড়ালি ছাপিয়ে জল ওঠে। স্রোত পা বেয়েও খানিকটা উঠতে চায়। বাঘারু পা টা জলে ফেলেই স্রোতের টান বুঝতে পারে। বাঘারুর পা-টা পেয়েই স্রোতটা একটু সঙ্কুল হয়ে ওঠে। আওয়াজ একটু বদলায়। জলের সারা রাতের উষ্ণতা বাঘারুর পা বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। বাঘারু পা ফেলে। পায়ে লেগে নুড়ি গুলো ছিটকে যায়। নদীর মাঝামাঝি একটা চওড়া পাথরের ওপর বাঘারু দাঁড়ায়।" ২১

গ) "গয়ানাথ মোক এইঠে পাঠাছে। বাথান করিবার। মুই আধি চাহ নাই। মোক বাথান দিছে, এইটে মোক কায়ও খুঁজি পাবেন না। মুইও কাক পাম না। মুই এইঠে আগত আসি নাই রো। মুই এইঠেকার বন চিনি না রো। গয়ানাথ মোক এইটে পাঠাছে। মোর অচিনা জায়গাটাত পাঠাছে। মোক উদাস করিবার তানে পাঠাছে।"

প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে অবগত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবাচক বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তে লক্ষ করা যায়।

ক) "বাঘারুর কাজের পরিচয়টাতেই সে নিজে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে সেই পরিচয় ছাড়া এই একজনের সম্মুখীন হতেও তার সঙ্কোচ হয়"? ২২

খ) "এতক্ষণ বাঘারু আর তার মোষ ছাড়া এই কাঠ সরানো চলছিল কী করে?" ২৩

গ) "কিন্তু কিছু একটা ঘটেছে, ভোখা বোবা বনি গেইছে, তয়? তয়? হঠাৎ বাঘারুর সন্দেহ জাগে 'পোয়াতির বাচ্চা হওয়া ধরিল: নাকি? এল্যায়?'" ২৪

বাক্য গঠনে দেবেশ রায় নানা বৈচিত্র এনেছেন। যেমন —

১) ব্যাকারণের গঠন রীতি না মেনে —

ক) "বাঘারু লোহার পাতের একটা বাণ্ডিল: ছোট দেখতে পায়।" ২৫

খ) "সে বোঝার চাইতেও বেশি বাঘারুকে গত দশ বার বছরে মাত্র এই তৃতীয়বার আত্ম পরিচয় সংক্রান্ত সংলাপে বাধ্যত অংশ নিতে হল"। ২৬

গ) "যেন এই খবর, এই খবর জানার আনুষঙ্গিক ছিল— অন্তত এমন কিছু নৌকো, যা সারারাত ধরে এই

চরের মানুষের সংসারকে ডাঙ্গায় নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে।" ২৭

২) রাজবংশী জটিল বাক্য— 'আমরা যেই টাইমে ওই সব আলোচনা করিবার ধইচছি, আলোচনা আর কথাবার্তা চলিছে, আর আমাদের কুনো মানষি যখন জমিতে নাই, সগায় গেইসে সার্ভের জায়গায়, রিশিকেশ গান গাহিবার ধরিছে, স্যালায় এই বীরেনবাবুর ঘর, এই কোম্পানীর ঘর, আমাদের পাছত দিয়া, লুকাইয়া আমিনবাবুকে দিয়া এইঠে আমাদের জমিতে চেইন ফেলিছে।" ২৮

৩) বর্ণনার ভাষায় শিষ্ট বাংলায় জটিল বাক্য —

ক) "চারিদিকে বালিরডাঙার মাঝখানে একটুখানি কাল জল টলটল করত — বাচ্চারা সাঁতার কাটতে পারে এই রকমই জল- এই ক'দিনের বাতাসে সে পুকুর ভরে গেছে, তার ফলে জায়গাটিই হয়ে গেছে ফুটবল মাঠের মতন সমান।" ২৯

খ) "শুনতে পাচ্ছে — তিস্তার ভূখন্ড বদলানো যে বন্যা পাহাড় থেকে নামছে এই চর, ও এই রকম আরও অনেক চর, বা গ্রাম, বন, ভাসিয়ে নতুন রকমে ভূখণ্ডটাকে সাজাতে, সেটা পৌঁছবার আগেই চরের প্রথম উদ্বাস্তুর পাল অনভ্যস্ত সময়ে চার পায়ে পথে নেমে প্রায় অন্ধের মত এই নদী তীরে ছুটে আসছে।"৩০

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বড় জটিল বাক্য যেমন আছে তেমনি আছে ছোট বাক্য, দু'তিনটি শব্দে, এমন কি একটি শব্দেও। 'চৌদ্দ' অধ্যায়ে সুহাসের সঙ্গে আলাপচারিতায় বাঘারুর কথা গুলি ছোট ছোট বাক্যে।

'এইটে ত অনেক ফরেস্টার। অনেক বর্মন।.........। হুজুর! দেখি নেন।........... ত দেখাও।............। তুলো হে তুলো।'

'একশ সাতাশি' অধ্যায়ে বাঘারুর তৃতীয় সংলাপের ভাষাতেও বাক্যের ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম রূপ —

'ত গয়ানাথ তোমাক ছাড়ি আর কাহাকও কহে না?'

'না জানো।'

' গয়ানাথ কহিলে সব মানুষ মিছিল ধরিবে হাটত?

'ধরিবে।'

.........................।

'এর বাদে কুন হাট বড় হাট?

ক্রান্তির হাট।'

'মুই কম গয়ানাথক ঐ হাটত থাকিবার?

'কহেন।'

এতে সংলাপের ভাষার বহু স্বরিক রূপটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বক্তব্য বিষয়কে সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় নিবদ্ধ করার জন্য জটিল বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য। "কিন্তু এখন এমন সব ঋতু বিপর্যয়, যখন পাহাড় থেকে ঢল নেমে নদীকে ক্রমেই করে তুলেছে যে কোনো আয়তনের পক্ষেই অনেক বড়, যখন জলের রং চেনা বদলে গেছে, জলের ওপর হুমড়ি খেয়ে তার একেবারে ঘোলাটে মেঘের মত সাদা রং, ফেনা, আর ফেনা কেটে গেলে আচমকা কাদাগোলা জল চিনতে হয়, যখন জল যেন নদী বয়ে আসছে না— নদীময় পাতাল থেকে উথলে উঠছে, তখন বাঁধের ঠিক নীচেই নদীর গভীর ভেতর থেকে ভাদই চিৎকার করে ধমকে ওঠে বাঁধের ওপর মহেশ্বর জোতদারকে — বাবা গে, বাঁশ ফেলিদাও, বাঁশ ফেলিদাও।" ৩১

শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী বাক্য —

"বাঘারু ও রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ঘিরে ছেলেদের নাচ ভেদ করে মঞ্চে শ্রীদেবীকেই যেন শুধু দেখে। দেখে, বেটি ছোয়াখান ক্যানং তলপেটখান উঠাছে নামাছে, উঠাছে নামাছে।" ৩২

বর্ণনার ভাষা পুরোপুরি রাজবংশী —

"বাঘারুর ত এই পাতা গুলান নাগে। যেইটে যাছে বাঘারু, ঐঠে যদি এইলা বড় বড় তরিকা পাতা সাইজের পাতা গিলা, এ, ধর কেনে একখান হবা ধরিবে সিকিখান দশফুটি টিন। তা ধর, কেনে, চারখান পাতা জোড়া লাগিলে—একখান টিন হয়্যা যাবে। আর দুইখান টিন পাঁশত দিবে—ব্যাস, বাঘারুর এই ঠাং দুটা বাদ দিয়া বাকি শরীরখানের উপরে চালা উঠি যাবে।" ৩৩

রাজবংশী বাচনে শিষ্ট বাংলা —

"আচ্ছা ধরেন কেনে, কংগ্রেসই সম্মিলন করিছে, শ্রীদেবীকও নাচাচ্ছে। স্যালায় ত তোমরালা কিছুই করিতেন না। এই হেমেন দা, একখান বুদ্ধি করো।" ৩৪

রাজবংশী যুবক সুস্থিরের বক্তব্যে শিষ্ট বাংলার সঙ্গে রাজবংশী মিশ্রন পাওয়া যায়—

"হেমেনবাবু এম এল একে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর কথাই বলি দিছেন।" ৩৫

রাজবংশী বাচনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার —

'না, না, এখানে শুকনো লঙ্কা হয় কোটে? এইঠে ত শুকনা লঙ্কা না হয়। ধরেন, এই ক্রান্তির হাটতও বছর খানিক আগতও শুকনা লঙ্কা না আছিল। তখন নারায়ণ প্রসাদের গোডাউন ছিল শিলিগুড়ি।'

"সে ত এই বছর খানেক আগে খুলি গেইছে। ত ফ্যাকটরি ত আর চলে না। গ্রিনটি বেচা হয়া যায়।" ৩৬

রাজবংশী বাক্যে বিকৃত উচ্চারণে ইংরাজি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—" খাড়াও হে হুজুর। তোমার টর্চখান আর চোখত না ফেলো। হ্যা, রেডি, ওয়ান-টু- থিরি।" ৩৭

তিস্তাপারে ঐতিহাসিক কারণে, দেশ ভাগের পরিণতি হিসেবে পূর্ববঙ্গাগত 'ভাটিয়া' দের বাস । বিশেষ করে চর এলাকা গুলো পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র মানুষদের দ্বারা অধিকৃত। ওদের মুখের ভাষায় এসেছে পূর্ববঙ্গের বাচনরীতি, উচ্চারণ, শব্দ, বাক্য, প্রবাদ, গান, ইত্যাদি। আবার কখনো রাজবংশী মিশ্রনও ঘটেছে

"কেডায় কইছে ব্রিজ হব, অ্যাঁ, কেডায় কইছে? নে, বাবা, আমরা ত পইড়লাম গিয়া, সাত হাত জলের তলায় ত ধরেন গিয়া, ঐ ফুল ঝোরার ব্রিজ নিয়্যা ত গত ত্রিশ বছর ধইর‍্যাই কত কাণ্ড। আমি যখন ধরেন বিশ বছরের জুয়ান তখন খগেন দাশগুপ্ত মন্ত্রী। আর সেই কী কয়, আরে তখুন মাল বাজার জেনারেল সিট, কী নাম সেই এমএলএ তারে তখুন কইলেই কয়, হয়্যা গেল গা, এই ধর সামনের বর্ষার আগেই হয়্যা যাবে নে, একবার ত কাণ্ড—"৩৮

উত্তরবঙ্গের চা বাগান গুলিতে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা পুরুযানুক্রমিক ভাবে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছে। তাদেরকে মদেশিয়া বলা হয়। এদের কথাও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ফলে মদেশিয়া ভাষা, রাজবংশী-ইংরেজি মিশ্রণে মদেশিয়া ভাষা নানা ঘটনা বা প্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। তাতে চরিত্র ও ঘটনা অধিকতর বাস্তব সম্মত হয়েছে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মদেশিয়া জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"সাথিমন, চা বাগান কো লেবার লোক অউর কিষাণ লোক দুষমন নালে। ভাই ভাই হ্যায়। সাথি সাথি হায়। এককো দুখ অউর কো বুঝনা পড়লেক। নাহি বুঝলে তঁ মালিকমন মজুরকো অউর কিষাণকো খতম করনে পড়ে।" ৩৯

মদেশিয়া ভাষায় এরকম বক্তৃতা বা আলাপ চারিতায় অনায়াসে ঢুকে পড়ে ইংরেজি শব্দ। চা বাগান এলাকা বলে — বাঙালীবাবু, শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে থেকে এসব ইংরেজি শব্দের আমদানি।

"লেকিন সাথিমন, হামার এই ক্ষেতিপর এক খারাপি কাম হলেক, কী না, চিয়া বাগান কো ভেস্ট ল্যাণ্ড

পর কিষাণ লোকোঁ জবর দখল কায়েম করতা থে। এতনা জবর দখল যে ই গবমেন্টকো সেটলমেন্ট ভি উ হোনা নাহি দেগা। ....হামনি মনকো ই ডিম্যাণ্ড হ্যায় কি যো ই ভেস্ট জামিন কো পুরা মাপ করনে হো গা, অউর কোন কো পাশ কেতনা জামিন হ্যায় ইসকো লিস্ট বাহার করনে হোগা।" ৪০

কিন্তু মদেশিয়া আলবিশ যখন বাগানের বাঙালীবাবু বীরেনবাবুদের সঙ্গে কথা বলে তখন বাংলা রাজবংশী মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি করে ফেলে— 'তোহার মাল কি কার (মালিকেরা) এতনা ঠিকা মজদুরকো কামমে লেতা রোজ, লেকিন কোইকো পার্মানেন করনে সে ত বুঝ আতা হ্যায়, কিয়া, না — ই বাগানপর কাম হ্যায় বহুত, ইসকো অউর জমিকো জরুরত হ্যায়।" ৪১

রাধাবল্লভ পূর্ববঙ্গের লোক হলেও তার বক্তব্যে কেমন আনায়াসে রাজবংশী শব্দ এসে পড়েছে "এই আলবিশ চলেন, এদের সঙ্গে আর কী কথা হবে। ঠিক আছে, আপনারা যা করার করেন। এখন হাটে হাটে ঢোলাই দেন রাধাবল্লভ সাহা ভাটিয়া, ও কেন রাজবংশীদের নিয়ে জমি দখল করে। তারপর চাঁদা দিয়া মানষি দিয়া একটা উত্তরখন্ড পার্টি খাড়া করেন।" ৪২

দেবেশ রায় ভাষা নির্মাণে অত্যন্ত সচেতন। শব্দ ব্যবহারের কুশলতাতেই চেনা যায় উপন্যাসের স্থান, কাল ও পাত্র-পাত্রীদের। উপন্যাসের স্থান উত্তরবঙ্গ, তিস্তাপার। জায়গার নাম গুলি চিহ্নিত করে দেয় এই অঞ্চলটিকে— গাজোলডোবা, ওদলাবাড়ি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পদমতী, রংধামালি, দোমোহনি, কাশিয়াবাড়ি, সিদাবাড়ি, চর দুই নম্বর, শিলিগুড়ি, নকশাল বাড়ি, ধূপগুড়ি, জটেশ্বর, ফালাকাটা, মাদারিরহাট, ডায়নার চর, সাকোয়াঝার ইত্যাদি।

সময় বামফ্রন্টের আমল। তাই কিছু রাজনৈতিক শব্দ আমলটিকে চিনিয়ে দেয়। জোতদার, জরিপ, আধিয়ার, খাশ, জোত, পাট্টা, পার্টি, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, নকশাল, উত্তরখণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড, বিচ্ছিন্নতাবাদী, কমরেড, দখল, উচ্ছেদ, বামফ্রন্ট, শ্রেণিসংগ্রাম, ডিমাণ্ড-ব্যুরোক্রেসি, এম এল এ, হাকিম, স্লোগান ইত্যাদি।

কথকের বর্ণনার ভাষায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, রাজবংশী, ভাটিয়া, মদেশিয়া, চাষি, মজুর, রাজনৈতিক, আন্দোলনকারী, প্রত্যেকের মুখে পরিস্থিতি অনুযায়ী কমবেশি ইংরেজি শব্দ বসানো হয়েছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এক বা একাধিক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন — সাইনবোর্ড, ক্যাম্প, সিজন, ইনজাংশান, কালচারাল ফাংশান, আর্টিস্ট, রেকর্ড, ম্যানেজ, অ্যালাউন্স, টেনশন, ট্রাইবেল, পপুলেশন, কনট্রাক্টর, ইন্টার প্রভিনশিয়াল, গ্রিনটি, গেজেটিয়ার, সেনসাস রিপোর্ট, বুর‍্যোক্রাসি, সিগারেট, সাউথ ইষ্টার্ন

বর্ডার, একসেলিরেটর, টি এস্টেট, এনলার্জড আউটলাইন, ম্যাপ, ক্রশ, ডিমার্কেশন,, ডিক্লিয়ার, স্পিল এরিয়া, টাইম, এমার্জেন্সি, রেসকিউ, কম্যাণ্ড্যান্ট, ডিসপার্স, এটেনশান, ডিস মিস, আরগু, সার্কিট হাউস, এনট্রেপ্রানিয়ুর, এ্যাকমোডেশন, স্লুইসগেট, ব্যারেজ, ইউনিয়ন, মিনিষ্টার, ইত্যাদি। জমি জরিপ, চা বাগানের ঘটনা, বন্যায় বাঘারুর উদ্ধারের ঘটনা, সীমান্ত বাহিনীর কার্যকলাপ এসব নানা ঘটনা ও কাজের জন্য ইংরাজি শব্দের এত প্রাচুর্য।

কিছু ইংরাজি শব্দ বিকৃত উচ্চারণে কিছু অশিক্ষিত চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়ে ভাষায় একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। যেমন — ইংজেরি (ইংরেজি), এমেলিয়া (এম এল এ), এলাউন্স (এনাউন্স), প্যারিড (প্যারেড), থিরি (থ্রি), পেরাকটিস (প্র্যাকটিস), ওর্নিং (ওয়ার্নিং), প্যাকিট (প্যাকেট), সিগিরেট (সিগারেট), ট্যানেসফার (ট্রান্সফার), এডিও (রেডিও), এসকু (রেসকিউ), রিকুয়েস্ট (রিকোয়েস্ট), ফন্ট (ফ্রন্ট) ইত্যাদি।

কিছু পূর্ববঙ্গীয় "ভাটিয়া" শব্দ উপন্যাসের শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে — যেমন — নকুইল্যা, কওয়ন, শ্যাষ, সুদ্ধা, কইলকাত্তা, সক্কল, খানতক, নরেইশ্যা, হ্যায়ন, হউগ্যা, অহন ইত্যাদি।

সঠিক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ বক্তব্যকে যেমন অতি স্পষ্ট করে, নির্দিষ্ট করে, তেমনি ভাষা সৌন্দর্যও সৃষ্টি করে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তের উপমা অলঙ্কার রাজবংশী, মদেশিয়া, ভাটিয়া জীবন ও তিস্তাপারের নিসর্গ থেকে নেয়া।

১) "বটগাছের গুঁড়ির মত ভুয়োদর্শী মোঙ্গলয়েড মুখ চামড়ার অসংখ্য কুঞ্চনে নদীর চরের মত জেগে থাকে"। ৪৩

২) "কোন নদী বা সোঁতা তার বহু দিনের খাত থেকে উঠে আসে যেন মাটির সঙ্গে লেপটে থাকা হাতি হঠাৎ তার শুঁড়টা প্রথমে আকাশে নাচিয়ে তারপর দুই তিন ধাক্কায় এক ঘুর্ণিঝড় তুলে, জেগে উঠল, আর নিজের এতক্ষণের ঘুমের ক্ষতি পোষাতে, যে দিকেই চোখ যায় সে দিকেই, খানিকটা ছুটে আবার ফিরে আসে, তার পায়ের চাপে ধুলোর ঝড় ওঠে, তার গা থেকে ধুলোর ঝড় ঝরে, তার শুঁড়ের ঝাপটা শুকনো ঝড় মাটি থেকে আকাশে লাফিয়ে ওঠে হঠাৎ।" ৪৪

৩) "সে স্রোত নয়, স্রোতে বাহিত— তিস্তার স্রোতের টানে যেমন ওপড়ানো শালগাছ ছোটে" ৪৫

প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তের ভাষাকে অধিকতর বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত করে তুলেছে। যেমন

১) "কুত্তা আস্তা (রাস্তা) হারায় না।" ৪৬

২) "কুত্তা আর গাই যা কওয়াবেন তাই।" ৪৭

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে কোন কোন চরিত্র বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গান গেয়েছে। গানের বাণী বা ভাষাও বিষয়ানুগ। তাতে গায়ক চরিত্রের ব্যক্তিগত রূপটি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সামগ্রিক পরিবেশটিও শ্রীমন্ডিত হয়েছে।

কৃষক সমিতির হৃষিকেশ চরুয়াদের উদ্দেশ্যে খানিকটা ঠাট্টা করে গান ধরে—

"ও-ও আমার চরুয়া হালুয়া ভাই

তোর গুণের সীমা নাই

তোর এতখান জমিতে ভোখো না মেটে

তোর প্যাটের সীমা নাই।" ৪৮

'পঞ্চান্ন', অধ্যায়ে নির্বাসন ভূমি ডায়নার চরের দিকে যাওয়ার পথে — বার ঘরিয়ার মাঠ ছেড়ে নিপুছাপুরের দিকে যেতে বাঘারু আপন মনে গান ধরে — সূর্য তখন উঠছে—

"উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর চিক চিকানি দিয়্যা

উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর আগুন টকটক হয়্যা

খুলি দিছু দেহবাড়ি ছ্যাঁকা দিয়া যান

জল যাউক, হিম যাউক, খাড়াউক শরীল খান।" ৪৯

'চুয়াত্তর' অধ্যায়ে 'দুধের ট্রাকের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বাঘারুর মুখে কোথা থেকে বিরহের গান বেরিয়ে আসে —

"বাথান বাথান করিসেন মইষাল রে-এ-এ-এ-এ

(অ-তোর) বাথান করিলেন ঘর

বাথান হইলেন আউলা ঝাউলা রে-এ-এ-এ-এ

(অ-তোর) বাথান ভরা গোবর।

অ-মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ-এ-এ" ৫০

'একশ চুরাশি' অধ্যায়ে জল্পেশ অভিযানকারী মহিলারা জল্পেশ মন্দিরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে তিস্তাবুড়ির গান গায় —

"সগ্গ হতে নামিল তিস্তা বুড়ি

মনচে দিয়া পাও

মনচ হতে নামিল তিস্তাবুড়ি

চ্যাতন করিল গাও

কাচা দুধ আলোয়া ক্যালো

ভইক্ষণ করো।" ৫১

'দুশ দশ' অধ্যায়ে দেবপাড়া চা বাগানের চা শ্রমিক মেয়েরা ট্রাকে করে তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে একে অন্যের পিঠে বা ঘাড়ে মাথা রেখে ট্রাকের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে কান্নার সুরে গান ধরে —

"মাসি, তুই আর ভাল কম্বল খুঁজিস না,

সব কম্বলে একই লোম,

সব লোমে একই উকুন

সারা রাত জেগে থাকি আর উকুন কুটুস কুটুস করে কামড়ায়

নাকি উকুন কামড়ায় বলেই সারা রাত জেগে থাকি।" ৫২

সমবেত গানটা একসময় বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আর একটি মেয়ে তার মায়ের কোলে মাথা রেখে গান ধরে —

"আকাশ ত পরিষ্কার হয়ে গেল,

কাল মুরগিটা সাদা হয়ে গেল,

নাকি কাল মুরগিটাকে ঢাকা দিয়ে

শাদা মোরগটা তার পাখনা মেলে দিল

আর ঝুটিটা ফোলাল। এ

আর সারা রাতের পর তোর সময় হল রে বিদেশীয়া বন্ধু

পান সুপুরি নিয়ে আমার গোসা ভাঙানোর?"৫৩

রাজবংশী কৃষক, চা বাগানের শ্রমিক, চরুয়া, সীমান্ত বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবন যাপনে রস রসিকতা স্বভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে। তাই রসিকতা পূর্ণ বাক্যের

ছড়াছড়ি তিস্তাপারের বৃত্তান্তে। কখনো সে রস শ্লেষাত্মক ও আদিরসাত্মকও হয়েছে।

গয়ানাথ তার জামাই আশিন্দিরকে বলেছে- "শালো জোয়াই, তোর পাছাত বাংকুয়া (বাঁক) সিন্ধাম" ৫৪

নদীতে গয়ানাথের জমি কতটুকু বোঝাতে বাঘারুকে জলে নামিয়ে গয়ানাথ সিদাডোবা, হাতিডোবা, নামকরলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা রসিকতা করে বলে — "এইটে শুরু হইল স্যার সিদাডোবা, হাতিডোবা, বাঘাডোবা।" ৫৫

উত্তরে গয়ানাথ রেগে বলে — " শ্যালো তোর বাপাডোবা" ৫৬

গয়ানাথ সুহাসকে দাগ নম্বর দেখাতে চাইলে ফের রসিকতা করে পূর্ববঙ্গের লোকেরা বলে " কুঁচকি পর্যন্ত দেখাইয়া ছাড়ছেন ত।" ৫৭

উত্তরে ফের গয়ানাথ বলে — " তোর ধোকর বাপের ঘরখান বাকি আছে রে।" ৫৮

বাঘারু গাছ সহ ভেসে এসে নিতাইদের ডুবন্ত চরে অশ্বিনী রায়ের চালে আটকে গেলে — বাঁধ থেকে কেউ তাকে দেখে। এনিয়ে পরস্পরে কথা হয়। জগদীশ জিজ্ঞেস করে " কয়ডা মানুষ ? বেটা ছেলে না মেয়ে ছেলে' ? তখন জগদীশের কথায় কেউ কেউ হেসে উঠে বলে — আরে আপনার সেই মানা বাড়ির মাগিটাই তো ভাইস্যা আইসছে। এহন সামলান গিয়া।" ৫৯

বাঘারু উদ্ধারের জন্য শহর থেকে জিপে করে অফিসাররা এসে বাঁধের লোকের কাছে নৌকা খোঁজ করে। নেই বললে অভিযোগের সুরে কারণ জানতে চায়, কাছাকাছি কারও আছে কিনা জানতে চায়। তখন জগদীশ বারুই পেছন থেকে বলে ওঠে — "হয়, আইপনারা নৌকা রাখবেন , আলকাতরা মাখাইবেন, গাব ঘষাইবেন আর উনারা আইস্যা বছরে একবার জিপে কইর্যা নৌকাবিলাস করিবেন।" ৬০

বাঘারু উদ্ধারের পর টিভি খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররা এসে নানা পোজে বাঘারুর ফটো তুলতে থাকে। নেংটি পরা বাঘারুর ছবি নিতে গিয়ে ফটোগ্রাফাররা রসিকতা করে , কেউ বলে— লোয়ারপার্টে টেলিফেলো না। কেউ বলে — "দেখিস, আবার নেংটির ভেতরের লোম সুদ্ধু তুলে ফেলিস না।" ৬১

ময়নাগুড়ির মরণচাঁদের দোকানে গয়ানাথ ও আসিন্দির একসাথে চা-মিস্টি খেতে খেতে আসিন্দির গয়ানাথকে উত্তরখণ্ডে যোগ দিতে বলে। 'তোমাক কহিলাম জয়েন দেন। বোম্বাইটে সিনেমার বেটিছোয়া আনিবার ধরিছে।'

গয়ানাথও কম যায় না, বলে —"মোক কি বেটিছোয়ার মত নাচিবার নাগিবে এলায় ?" ৬২ তাঁর বর্ণনার

ভাষা যুক্তি নির্ভর, নির্দিষ্ট, আবেগহীন। কিন্তু রসহীন নয়। তবে কোথাও কোথাও আবেগময় কাব্য ভাষার সন্ধানও পাওয়া যায়।

'বাহান্ন' অধ্যায়ে নির্বাসিন ভূমিতে যাওয়ার পথে বাঘারু শেষ রাতের চাঁদ দেখে—"বাঘারু ফরেষ্টের মাথার ফাঁক দিয়ে চাঁদটাকে দেখে। ফরেষ্টের ভেতরটায় এখনো অন্ধকার—শেষরাত্রি। সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আকাশটা আরও সবুজ ও চাঁদটা আরও স্পষ্ট দেখায়। সকালের শাদা চাঁদ নয়, রাত্রির জ্বলজ্বলে চাঁদ। এখন এই হাতির রাস্তাটা ছেড়ে ফরেস্টের ভেতরে ঢুকলে চাঁদের সেই আলো পাওয়া যাবে। ফরেস্টের ভেতরের এই রাত্রির আড়ালে আড়ালে চাঁদটা আরও অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে। মাঝখানে একখান আগুন লাইনের সড়ক— ফরেস্টটাকে দু'ভাগ করেছে। বাঘারু বাঁয়ে ঘুরে, দাঁড়িয়ে পড়ে। ফরেস্টের ভেতরের রাত্রির ওপরে চাঁদটা ডাইনে লেগে আছে। কিছু দূর গিয়েই সে আলো আবার আবছা। এখনো আকাশে দিনের আলো এত জমে নি যে এই আগুন লাইনটা পুরো দেখা যাবে। মাঝখানের সেই অন্ধকারের পরে ঐ আগুন লাইনের শেষের আভাস দেখা যায়— আকাশের সবুজ আর নদীর বালির শাদায়। মনে হয়, সেখানে আরও বেশি সকাল হয়ে আছে।' ৬৩

'একাত্তর' অধ্যায়ে ডায়নার চরে বাথানে থাকাকালীন - বাঘারু দেখে —"কোন কোন পাখি পাখা নেড়ে ঘুম কাড়ে, গাছের পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি ওঠে, সে ধ্বনি গাছ থেকে গাছে গাছে চলে যায়। কোন কোন পাখি ডেকে ওঠার অপেক্ষায় গলায় একটা স্বগত ধ্বনি তুলতে থাকে — গলায় উঠে সে ধ্বনি গলার ভেতরে চলে যায়। মহিষের বাথানের এক দিক থেকে আর এক দিকে কান আর লেজ ঝাপটানোর আওয়াজ ওঠে। ঘাস বনে সির সির আওয়াজ থেকে থেকে থেমে গিয়ে সেই নৈঃশব্দ্যকে আরও নিঃশব্দ করে তোলে।"৬৪

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র নাট্যরূপ দিয়েছেন একালের প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক ও পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়। ছ'টি পর্ব, একটি পরিশিষ্ট, দু'শ উনিশটি অধ্যায়-এ সম্পূর্ণ পাঁচশ চার পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসকে নাটকের আকারে নিয়ে আসা তাতে সংলাপ সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক কাজ। প্রথম অভিনয় — রবীন্দ্রসদন, ৪ জুন, ২০০০। নাট্যগঠনের অন্যান্য দিক গুলোর কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু সংলাপের ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলতেহয় সুমন নিজেই স্বীকার করেছেন যে উপন্যাসে উপস্থিত সব পাত্র-পাত্রীর সংলাপ তিনি উপন্যাস থেকেই নিয়েছেন।

"মূলে যা আছে— সেই সংলাপ না বদলে আমি কাজটা করে যাচ্ছি, চেষ্টা করছি নাট্যের একটা চূড়ান্ত

শৃঙ্খলায় পৌঁছতে।" ৬৫

নাট্যকার, নাট্যসমালোচক ও অভিনেতা বিভাস চক্রবর্তী ও বলেছেন "প্রায় কোন সংলাপই তিনি (সুমন) যোগ করেননি বা কোন ঘটনা নতুন করে আনেননি— যা উপন্যাসে নেই।" ৬৬

এ কথার সমর্থনে বিভাস চক্রবর্তীর আর একটি মন্তব্য লক্ষ করা যায়। "এইসব সাত পাঁচ যখন ভাবছি হঠাৎই চোখে পড়ল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'উপন্যাসটির লেখক দেবেশ রায়ের একটি রচনা— 'মঞ্চের উপন্যাস পাঠ'। তাতে দেবেশবাবু বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে সুমন মঞ্চের জন্য তাঁর উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেবার প্রথাগত চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছেন, উপন্যাসটি মঞ্চে পাঠ করেছেন তিনি।' এরপর দেবেশ রায়ের বক্তব্যটি হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে —" মঞ্চের উপন্যাস পাঠের স্বরলিপি উদ্ধার করতে করতে যদি আমরা এ নাটক না দেখি তাহলে হয়তো আমরা এ নাটকের কাছে নাটক চেয়ে বসব, নাটকের যে গড়ন বহু বিচিত্রতায় আমাদের চেনা। এমনকি এমনও মনে হতে পারে কী আছে এ নাটকে। আর তাতে হয়তো সুমন মুখোপাধ্যায় সত্যি করেই জবাব দিতে পারেন, এটা তো নাটক নয়, মঞ্চে উপন্যাস। তাহলে এ নাটক দেখতে কি উপন্যাস পড়ে আসতে হবে? না, তা কেন, মঞ্চই তো উপন্যাস পড়বে।" তারপরই অবশ্য বলেন , " মঞ্চ উপন্যাসটি যে পড়েছে তাতে খুব গোপনে স্বরাঘাত বদলে যাচ্ছে যেন একটা নিঃসংশয় রাখতে, দ্বিধাহীন রাখতে, যে উপন্যাসটি মঞ্চই পড়ছে, দর্শকদের সামনেই পড়ছে, মঞ্চের শর্ত মেনেই পড়ছে।"৬৭

হুবহু সংলাপ বজায় রেখে নাটকের শর্ত মেনে তিস্তাপারের নাট্যরূপ ও বহুবার মঞ্চ সফলতা প্রমাণ করে— এর সংলাপের নাটকীয়তা। যেমন —

"ঘোষ একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করে, ক্যাম্পে তোমার কে আছে?

'কায়না কায় তো থাকিবে বাবু।'

'তোমার তো বাড়ির কেউ নেই বললে?'

'না বাবু মোর বাড়ির কেউ নাই রো।'

'ইণ্ডিয়া বাংলাদেশও নেই?'

'না, বাবু মোর ঐলা কিছু নাই রো।'

'তোমার দেশ নেই? একটা?'

'না বাবু মোর দেশ নাই রো।'

তাহলে ক্যাম্পে আর তোমার কে থাকবে?

'মানষিলা ত থাকিবে বাবু, বানভাসি মানষিলা।'

উপন্যাসে ভাষা তো কথক ও চরিত্রের মুখ দিয়েই উচ্চরিত হয়। উপরোক্ত আলোচনায় তা লক্ষ করা গেল। আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র পঞ্চানন মল্লিকের ভাষায় — সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে। বক্তৃতার সময় তিনি শুরুই করেছেন গীতার একটি সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে।

'হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীং'

বক্তৃতায় এসেছে গুরুগম্ভীর তৎসম বহুল বাংলা ভাষা—

"ভারতবর্ষ মাতৃভূমি। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করায় প্রতিটি ভারতবাসীর মত আমরাও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি।' তারপরেই যোগ করেন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাংশের মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আজ পর্যন্ত যা করার দরকার ছিল তা করেননি। .... সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছেন এখনকার বসবাসকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ রাজবংশী, সংখ্যালঘু মুসলমান, বাস্তুহারা নমশূদ্র, বহু উপজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ।" ৬৮

'তিস্তাপুরাণ'-এর ভাষা রীতি

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো তিস্তাপুরাণও একটি মহাকাব্যোপম.. বৃহৎ উপন্যাস। এর-রচনা রীতিও 'এপিসোডিক'। বিষয়- তিস্তা পারের তিস্তা ও বড়বাঁক, আংরাভাসা, নোমাই, গরাতি, গুলুন্দি, জলঢাকা, কুলজুয়া, দুদুয়া ইত্যাদি ছোট বড় নদী বেষ্টিত ভুবনে বুড়িমার গোত নামে পরিচিত একটি রাজবংশী বৃহৎ পরিবারকে ঘিরে বিশেষত রাজবংশী সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনীতিক প্রসঙ্গে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক পরিচিতি—লেখকের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিমত। বিষয় বিন্যস্ত হয়েছে গোত্রনারী বুড়িমার অলৌকিক 'বানা ঝোলা দর্শন'কে উপলক্ষ করে। সমগ্র উপন্যাসে বয়ে গেছে পৌরাণিক আবহ সুতরাং স্বাভাবিকভাবে তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সমুদয় ভাষা বৈশিষ্ট্য তো এতে আছেই, আছে আরও অন্য অনেক কিছু।

তিস্তাপুরাণও যুগপৎ বাংলা ও রাজবংশী ভাষায় লিখিত। কথকের বর্ণনার ভাষা বাংলা। কিন্তু এখানেও বাংলার সঙ্গে কোথাও কোথাও অনায়াসেই মিলে গেছে রাজবংশী শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ। আবার কখনও বর্ণনার ভাষা সম্পূর্ণ রাজবংশীতে। এখানেও উত্তরবঙ্গের মদেশিয়া-বাংলা মিশ্রিত ভাষাও রয়েছে। উপন্যাস

খানি পৌরাণিক আবহে নির্মিত বলে কিছু পৌরাণিক শব্দ ও বাক্য এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আর এজন্যই তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো কথায় কথায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এতে নেই। আছে, তুলনায় কম।

পুরাণ বলেই এতে -দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা প্রচুর, যা তিস্তাপারের বৃত্তান্তে দেখা যায়নি। তবে একটি শব্দে একটি বাক্যের ব্যবহারও আছে।

বাক্যের প্রচলিত নিয়ম ভাঙার প্রবণতা এখানেও লক্ষ করা যায়। কিছু অপ্রচলিত শব্দ, এমনকি লেখকের নিজের তৈরি শব্দও সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণনার ভাষায় কোথাও কথকতার ভঙ্গি, সহজ-সরল-মেদহীন, কিন্তু বিষয়গুণে ভারি। তিস্তাপুরাণের ভাষা প্রসঙ্গে অভিরূপ দাস বলেছেন।

"তিস্তাপুরাণ, আসলে মহাকাব্য। মহাকাব্যের মত উপন্যাস কেউ কি কখনো পড়েছে? সেই বিপুল উপন্যাসে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তি সম্পর্ক ভেঙ্গে নিজের সুবিধে মত ব্যবহার করে, প্রয়োজন মিটে গেলেই আবর্জনায় ফেলে দেয়ার কোনো তুলনা নেই। স্রষ্টার নিরাসক্ত নিষ্ঠুরতা তিস্তাপুরাণে চোরা স্রোতের মত বয়ে আসছে—সে নিষ্ঠুরতা তুলনাহীন। এই মহাকাব্যিক নিষ্ঠুরতা তিস্তাপুরাণে চোরা স্রোতের মতো বয়ে গিয়েছে। দেবেশ রায়ের গদ্য আমাদের পাঠ্যাভ্যাসে প্রোথিত আছে। ....এখানে নিরাসক্তির ভাষা, আমাদের অচেনা। সরলবাক্যের কুটতা আমরা জানিনা। আতিশয্য নেই। আবেগ নেই। আত্মমগ্নতা নেই। নিজেকে আড়ালে রেখে এক এক ভাষার কৌতুক এর আগে ওঁর কোনো লেখায় দেখিনি। এই ভাষাই পুরাণের ভাষা হতে পারে। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বা মফস্বলি বৃত্তান্ত, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত-এ ভাষায় লেখা যায় না।" ৬৯

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো তিস্তাপুরাণেও দেখা যায় ভাষার প্রবাহমানতা। সেজন্য এখানেও সংযোজক অব্যয় বিহীন, কমা দিয়ে সরলবাক্যের পরপর বিন্যাসে দীর্ঘ বাক্য গঠন লক্ষ করা যায়।

"বেটিছোয়ার ঘরই তো দেশ থেকে দেশে, পৃথিবী থেকে পৃথিবীতে, ঘর থেকে ঘরে ঠোঁটের কথা নিয়ে যায়, গলার গান নিয়ে যায়, মুখের ঢক নিয়ে যায়, জিভের স্বাদ নিয়ে যায়, চোখের চাহন নিয়ে যায়, ওঠা-বসা নিয়ে যায়, আঙ্গুলের বোনা নিয়ে যায়।" ৭০

ছোট ছোট সরল বাক্য পর পর বসিয়েও ভাষার প্রবাহমানতার দৃষ্টান্ত তিস্তাপুরাণে প্রচুর।

কাঁওক পাঠা কেনে। দুই চারি জনক। সিনঝাকাঠি গিলা ঠিক করি দিক। পাখি না ঢুকে। আর কিছু করিবার থাকিলে করি চলি আসুক। কালি আবার যাবে।' ৭১

দীর্ঘ সরল, জটিল, যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে বক্তব্যকে সুসংহত করার দৃষ্টান্তও তিস্তাপুরাণে দেখা যায়। জটিল যৌগিক, বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপুরাণের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়। পুরাণের কথা তো এভাবেই বলতে হয়।

(ক) 'ঢেমনার মৃতদেহ ঠাকুরাণীর ঘরের কাছে শোয়ানোর পর, বাহির এগিনার দুই দিকের ভিড় ভাঙানোর আগে, যারা তাকে জীবিত ও চলন্ত দেখেছে সারা জীবন তারা তার মৃত মুখের ও দেহের দিকে এক পলক নিবিড় চাইবারও আগে, তার মৃত দেহের সৎকারের জন্যে অনিবার্য কাজগুলি শুরু হওয়ারও আগে, বুড়িমার গোতের দুই বড় হালুয়া চলে যায় ঢেমনার তামাক ক্ষেতের দিকে।' ৭২

(খ) 'ফলে, পাঁচটি মেয়ে ফিরে ছুটে আসা পথে আবার ছুটে গেলে যেটুকু জায়গা লাগার কথা, তার চাইতে কম জায়গা লাগছিল আর ঐ উড়ন্ত চুলের জন্যেই, এমনও মনে হচ্ছিল— ঐ কাল চুলের রাশি ধরে রেখে তারা কোনো ব্রত পালনের মুদ্রায় ছুটছে।' ৭৩

'তিস্তাপুরাণ', একটি আধুনিক পুরাণ। পুরাণ কথা শুরু করলে তো কথা শেষ হতে চায় না। তাই এখানে স্বাভাবিক ভাবেই বাক্য হয়েছে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম।

(ক) দীর্ঘবাক্য—"যারা গরুর পালের দেখাশোনা করে, তাদের চড়ায়, ছাড়ে, যাদের গলা গরুদের চেনা হয়ে যায়, যারা গরু গুলিকে গোহালিয়ায় ঢুকিয়ে দেয়, আবার কখনো কখনো বেরও করে, তারা ফরেস্টের একটা সুবিধা মত জায়গায় বসে, তেমন লাগসই একটা গাছ পেলে, গাছের মোটা ফ্যাকরার ওপর চিত হয়ে শুয়ে, কাত হয়ে শুয়ে, উপুড় হয়ে শুয়ে মাঝে মধ্যেই ডেকে যায়, 'হা—আ—স্বা গে—এ—এ"। ৭৪

(খ) দীর্ঘতর বাক্য—"সেখানে না-ফেরা গরুগুলো ফিরে এলে, সেগুলো নিয়ে তার তিন মানব জন্মের ফরেস্ট, তার জন্ম জন্মান্তরের দুটো নদী, হয়তো আরো নদী, তার জন্মের আগের চা-বাগান আর রেল লাইন— সে তো এ বাড়ির বৌ, আর এসেছে সেই তিস্তার এ পারেরই গাঁও থেকে, তিস্তা সেখানে পুবে এমন বাঁক নিয়েছে যে পশ্চিম দিকটা যেন, আকাশ যেখানে মাটি ছোঁয় সেইখানটাও ছাড়িয়ে গেছে, মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত বাস যায়, তারপর আধ বেলার হাঁটা, সে একটা রেল লাইন দেখেছে, সে অন্য রেল লাইন— তারপর তোর্সার মত বড় নদী তার জন্ম জন্মান্তর আগে যেখানে বইত, সেই বালুবাড়ি পাথর বাড়ি পার হয়ে গরুর পালটাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে নাম্বু-ঝাটো-আন্ধারুর সঙ্গে নদীবাড়ি পাহাড় বাড়ি জঙ্গলবাড়ি ধরে ধরে তাকে হাঁটতে হবে।" ৭৫

(গ) দীর্ঘতম বাক্য—"কোন ক্ষেতে কী রোয়া হবে, কোন ক্ষেতে কতটা করে পচা সার খাওয়াতে হবে, শীতকালের হিম আর সাত-সকালের পাতলা হাল দিয়ে কবে থেকে মাটিকে খাওয়াতে হবে, ভাদই চাষের জন্যে কোন কোন ক্ষেত আগে তৈরি করতে হবে, গেল বছর বৃষ্টি না হওয়ায় এ বছর যদি আগে বৃষ্টি হয় সেজন্য বিত্‌রি ধানের জমিই বেশি করে তৈরি হচ্ছে, এত জমিতে ছিটনোর মত বিত্‌রির বীজ এক বাড়িতে থাকে না, সেজন্যে অন্য সব হাউলিয়ার বাড়িতে খোঁজ করতে হয়, কেউ ধার দিতে রাজি আছে কীনা, ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখে বীজ ছিটিয়ে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণে ধান কাটা যায় এমন হিসেব করে জমি খুঁজতে হয়, বৃষ্টি যদি আগুরি হয় তাহলে আষাঢ়-শ্রাবণের ঢলে মাঠের পাকা ধান পচে যাবে— ঢালের জমি চাই, জল যাতে না দাঁড়ায়, চালের দাম যখন এত বেড়ে গেছে তখন বড়ি-বাংলা, লুধিয়ান বা ধৌলির মত দামি পাতলা চাল কম করতে হবে—দামি চালের দাম আর কত বাড়বে, তার বদলে জমিরা, কালশনি, আর কাশিয়াপাঞ্জা বেশি করে লাগাতে হবে— টাউনের মানষি সে চাল পছন্দ করবে, বাতাই চাষের খাউ-বিছনবাড়ি তৈরি করতে ফাল্গুন-চৈত্র থেকে ক্ষেত বানানো শুরু, খাউ-বিছন মাটি ছেড়ে উঠতে না উঠতেই পোতা-বিছন বাড়ি— তৈরি করতে হয়, বিত্‌রি ধান খোয়ার আর বাতাই ধান বেচিবার তার ওপর গত বছরের খরার ক্ষতি এ বছর উশুল করতে হবে— ধানের ক্ষতি পয়সায় ধান বেচে উশুল হয় না, ধানের ক্ষতি উশুল হয় ধানে, বেচো আর খাও ধান গোলা যেন এক বস্তাও খালি না দেখায়— তাকে বলে চাষ বাস, তার মধ্যে জোতদার গিরিকে ভাগ দিতে হবে, আধিয়ার মানষিকে খাওয়াতে হবে, সোদর কুটুম আসা-যাওয়া আছে, বেটা বেটির বিয়ে শাদি আছে, তার ওপর গত সনের খরা গত শনেই শেষ নাকী খরার চক্কর শুরু এই অনিশ্চয়তা আছে এতসব হিসেব নিকেশ তত্ত্ব-তালাসের মধ্যে সরকারের হুকুম লেভির ধান জমা দিতে হবে, তখন তো মনে হল ভুটান পাহাড় যদি পাহাড়েও থাকে, তাহলে মরাঘাট ফরেস্টে আগুন লেগেছে।" ৭৬ এমন অতিদীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নেই। কারণ সেখানে ঘটনাবলি মূলত রাজনৈতিক। খণ্ড খণ্ড বিষয়। তিস্তাপুরাণের গোতের সামগ্রিক জীবন বর্ণনার দীর্ঘায়িত ছবি সেখানে অনুপস্থিত।

বর্ণনার ভাষা শিষ্ট বাংলা—'বুড়িমা' অধ্যায়ে—'বুড়িমা যে বাড়িতে আছে, এটা কারো সব সময় আলাদা করে খেয়াল থাকে না। বুড়িমা কখন, কবে যে সবার এমন বেখেয়ালে চলে গেছে তা বের করা এখন প্রায় অসম্ভবই। কোনো একদিন নিশ্চয়ই ছিল যখন বুড়িমাই সবার খেয়াল রাখত, আর সে কারণেই বুড়িমাকেও সবার খেয়ালে রাখতে হত। কবে যে এমন ছিল তা মাপার সব হিসেব এখন তামাদি হয়ে গেছে। এবারের ধান

গতবারের ধানের সমান হল নাকী কম হল, নাকি বেশি হল, সে তো শুধু স্মৃতি দিয়ে মাপা হয় না, শরীরের স্মৃতি দিয়ে মাপা হয়।' ৭৭

বর্ণনার শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী বাক্য—'গুহাপথ' অধ্যায়ে- "নদিনী আর শাদুরী যে হাটে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তা এমনকী অগুন বা ধান রামের ও জানা ছিল না। জানা থাকার কথাও নয়। হাটোয়ালদের সঙ্গে ওদের খেতে বসতে দেখেও আন্দাজের কথা নয়। অসময়ে গরম ভাত নেমেছে। খাচ্ছে। ভাত খাওয়ার আবার কোনো কারণ থাকে নাকী। সবাই যখন বেরচ্ছে, তখনই দেখা গেল, নদিনী শাদুরীও বেরচ্ছে। সবাই যখন ঐ ডান দিকের পথে ঘুরেছে, তখনই দেখা গেল, নদিনী শাদুরীও ঘুরেছে। ততক্ষণে অবশ্য ওদের সাজ গোছ থেকে বোঝা যায় হাটোয়ালী হবার ধরিছে। তো ধরুক। কায়ও যদি হাটত যোয়া মনে করে তো সে চলুক ঢেলে কেনে হাটত। দূরের হাটত। ধূপগুড়ির হাটত।" ৭৮

অনুপুঙ্খ বর্ণনার ভাষায় তৈরি হয় চিত্রকল্প। 'গোবর নেথা', অধ্যায়ে - এগিনা ঝাঁট দেওয়া, মোছার দৃশ্য বর্ণনা অনুপুঙ্খ ও চিত্রল।

"কলেশ্বরীর অনুমান খুব ভুল নয়, এত সকালে যখন পুরোরোদই ছড়ায় নি, তখন বাহির এগিনা তো শিশিরে ভেজা থাকারই কথা। ক্ষেতবাড়ির দিকে তাকালে তো ক্ষেত আর দেখা যায় না, অঘ্রাণের পাতলা কুয়াশায় ক্ষেত বাড়ি ডুবে আছে। কলেশ্বরীর অবিশ্যি অনুমানেও এমন ভুল হওয়ার কথা নয়। আর ভুল যদি হয়ও, তা হলে লম্বা পাতলা বাঁশের খররা বারুনে দু-তিন ঝাঁট দিতেই তো ধুলো দেখে বোঝা উচিত শিশিরে মাটি তত ভেজা নেই। সেটাও যে কলেশ্বরী ধরতে পারেনি, তার কারণ, সে প্রথমে ঝাঁট দিয়ে আনছিল ডোবা পাড়ের ঘাসে পড়ে থাকা শুকনো পাতা আর কুটো। সেগুলো কাঁঠাল গাছের তলায় জড়ো করে রেখে সেখান থেকেই এগিনার মাটি ঝাঁটাতে শুরু করে। তাতেই এই ধুলো। পাথারনী ততক্ষণে একটা বড় কলসীতে জলভরে এনেছে ডোবা থেকে। বা কাঁখে সেই কলসী নিয়ে, কলসীটা একটু কাত করে জল ঢালে আর ডান হাতের সেই জল উঠোনে ছিটতে থাকে। পাথারনীর কব্জিতে পরা ছিল চোরা খারু। বাঁ-হাতে মাটির কলসী বের দেয়ায় সেই বালার সঙ্গে কলসীর ঘষায় একটা আওয়াজ ওঠে।' ৭৯

বর্ণনায় কাব্যভাষা—'সংলাপ আনালাপ' অধ্যায়ে এক বুনো নদীর বর্ণনা— যেন কবিতা। এ বর্ণনাতেও ফুটেছে চিত্রকল্প।

'দুই পার থেকেই ফরেস্ট একেবারে জলের ভিতর পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই পাড় মানুষজন কিংবা গোরু-

মোষ বা এমনকী কুকুরও, ব্যবহার করে না। বনশেয়াল করতে পারে। নদীর ভিতর থেকে গাছ এত উঁচুতে উঠে গেছে যে কোথা থেকে ডালপালার ফাঁড়া ফাঁড়ি তা দেখতে ঘাড় হেলাতে হয়। আবার দুই পাড়ের অনেক গাছ নদীর ওপরের আকাশে বেঁকে গেছে। নদীর জলে, রেতি নদীর জলে ফরেস্টের সবুজ, খয়েরি, হলদে, কাল ও আকাশের নীল ছায়া এত ঘন হয়ে পড়েছে যেন মনে হয় তারা সোলংগা চড়ে যাচ্ছে না, ফরেস্টের মধ্যদিয়ে ভেসে যাচ্ছে। নদীর একেবারে ভিতর থেকে যে গাছগুলো সিধে ওপরে উঠে গেছে, সেগুলোতে যাতে ঢাকা না লাগে, সেজন্যে ঘাটোয়ালকে লগি মেরে সোলংগার মুখ একটু সরিয়ে দিতে হয়। খুব কান পেতে শুনলে ফরেস্টের ভেতরের ঝিঁঝির আওয়াজ আর নদীর জলের আওয়াজ আলাদা করা যায়, তবে কান পেতে না রাখলে মনে হয় জলেই এমন প্রবল ঝিঁঝির রব উঠছে। সাধারণত আকাশ দেখলে ফরেস্টের ভিতরের নদী আন্দাজ করা যায়। আকাশটা ফাঁকা থাকে। এমন ছোট নদীতে আকাশ অমন ফাঁকা থাকে না। সেখানেও ফরেস্ট। আকাশ তো আকাশ, নদীই দেখা যায় না।" ৮০

বিভিন্ন চরিত্রের মুখে তার স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর ভাষা বলতে শোনা যায়। রাজবংশী চরিত্রের মুখে শোনা যায় রাজবংশী ভাষা। মদেশিয়া চরিত্রের মুখে মদেশিয়া ভাষা।

"ধোলী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায়, 'মদেশিয়া মানষিলা বস্তির মানষিলা মিলি তামান বাগান খান দখল নিবার ধরিছে। ঝাণ্ডা উড়িছে। চোঙা ফুঁকিছে। হাল চলাছে। সগায় তো বাগান দখল দেখিবার গিছে।" ৮১

অনুরূপ মদেশিয়া চরিত্রের মুখেও মদেশিয়া ভাষা—

"লোকটি কাপুর, বাবুর চেয়ারের কাছে গিয়ে বাবুকে বলে—

'এক কিষাণভাই বোলতা হ্যায়, রাতমে বারিষ হোনেসে মাটি ধু যাবে। হামমন পুঁছ করলেক, কৌন সে বারিষ হ্যায় যে মজদুর ঔর কিষাণ কো একাই ধু দেনে শেকতা?'" ৮২

মদেশিয়া ভাষায় ইংরেজি শব্দ যুক্ত হয়ে ভাষায় অন্যরকম স্বাদ নিয়ে আসে। "ছোট দাদাকে চুপ করে থাকতে দেখে কাপুর বলে ওঠে, 'বোলো কমরেড বোলো যো বাত হ্যায় বোলো। কিষাণ ঔর মজদুর কো একোহি বাত হ্যায়—ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ। ই-হামারা .. মজদুর ইউনিয়নকো সেক্রেটারি কমরেড কালী। সারে জিলা কোঁ সেক্রেটারি কমরেড কালী। বোলো।" ৮৩

মদেশিয়া ভাষার মত পূর্ব বঙ্গীয় ভাটিয়া ভাষা উচ্চারিত হয়েছে ভাটিয়া চাষীদের মুখে— (১) "এইড়া তো

আমাদের মহাভাগ্য যে আপনারা ডাইকছেন। কী কামে আইসব, জানি না। আমরা তো কুনো কামের না। তো যাব। নিশ্চয়ই যাব। বুড়া সাইজ্যাই যাব।' তারপর অগুনকে দেখিয়ে বলেছে, 'আমাদের বুড়াগুলা' তো অ্যামন জুয়ান না। দিন রাইত জলে ডুইব্যা আমাগো জোয়ান গুলাই বুড়া হইয়া যায়। আর সত্যিকারের বুড়াগুলা তো আর জলে ডুইবতে পারে না, রোদে বসিবসি শুকাইয়া শুকাইয়া খেজুর গাছের লাখান হইয়া যায়। আমাগো সাদা চুলে ভুইলবেন না বাবু। ভাটিয়াগো কাঁচা পাকার বোধ নাই।" ৮৪

(২) "দুদুয়ার পারের ভাটিয়ারা বুড়িমার গাঁওয়ে পৌঁছে বলে, 'ফরেস্টের এতখান ভিতরে তো এর আগে আসি না। এই সিধা গেলে কি পাহাড়ত ধাক্কা খাইব নাকী?'" ৮৫ ভাটিয়াদের ভাষায় এই রকম রাজবংশী ভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

এখানে বসি বসি রাজবংশী শব্দ। সুতরাং ভাটিয়া ভাষায় রাজবংশী শব্দও মিশে গেছে দুদুয়ার পারে বসবাসের ফলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ভাটিয়া ভাষায় এরকম রাজবংশী শব্দের প্রবেশ ঘটলেও রাজবংশী ভাষায় ভাটিয়া শব্দের প্রবেশ ঘটেনি। রাজবংশী ভাষায় দু একটি বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার থাকলেও প্রকৃত ইংরেজি শব্দের ব্যবহার খুবই কম। বিশেষত বর্ণনার ভাষায়।

কিন্তু উপন্যাসে বহু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন— ফরেস্ট, টাইম, বডি, প্লাস্টার, রেঞ্জ অফিস, লাইসেন্স, ব্রিজ, সিমেন্ট, ভ্যান, ক্যামিকেল, ভ্যানিস, বোল্ডার, কোর্ট, এফিডেবিট, পি. ডব্লিউ. ডি, রেকর্ড, ডিপার্টমেন্ট, ন্যাশন্যাল হাইওয়ে, নোটিশ, ম্যানেজার, কাপডিস, ক্যানেল, ডিপ-টিউবওয়েল, স্যালো, রিভার লিফট্, রেট, মিরাকল, ইণ্ডিয়া, ইউনিয়ন, পাওয়ার ক্যাপচার, স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিজ, ডিউটি, ইন্টারন্যাশনাল, প্লান, হেড কোয়ার্টার্স, চার্চ, অফিসার, ব্রেকডাউন ইত্যাদি।

বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ: ইংজেরি (ইংরেজি), হাইল (হাই ইল্ড), রেজিস্টারি (রেজিস্ট্রি), কনটাকটার (কনট্রাকটার), নুটিশ (নোটিশ), রিটান(রিটার্ন), পাট্টি (পার্টি), কমুনিস (কমিউনিষ্ট), গবমেন্ট (গভর্নমেন্ট), বি.ডি-অফিস (বি.ডি.ও. অফিস) বোড় (বোর্ড) ইত্যাদি।

তিস্তাপুরাণে উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার-প্রয়োগ তার ভাষায় বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। বর্ণনার ভাষা— সরস ও সতেজ হয়েছে। ভাষা একটা নতুন অবয়ব পেয়েছে।

ক) "তারা যেন এই কথাটা থেকে সরে যাচ্ছে। তারা জানে, তারা আবার— এই কথাটাতে ফিরে ফিরে আসবে। আবার সরে যাবে। ডোবার জলে হাঁসের মত।" ৮৬

খ) 'ঢেমনার মৃতদেহ থেকে জন্ম জন্মান্তরের আবেগ কেমন বৈশাখের বাতাসে আমের বোল যেমন, তেমন আলগা ঘুরছিল।' ৮৭

গ) "তার গলায় যে সর্বনাশের ডাক ছিল, সে ডাক শুনে, যারাই সে ডাক শোনে, তারাই ডাকের কাছে ছুটে আসে, ভয়ে বাচ্চা নিয়ে বানরীর গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে যাওয়ার মত ছুটে আসে, জল প্রান্তরের পার থেকে মুহূর্তে শূণ্যতায় বগার উড়াল দেয়ার বেগে ছুটে আসে।" ৮৮

ঘ) "ছোট দাদার গল্প যখন তার পরের রাত্রির ভিতর ঢুকে যায় বা তারও পরের রাত্রির ভিতর তখন স্পষ্ট হতে থাকে, একটু একটু করে স্পষ্ট হতে থাকে, পৌষমাসের নদীর জল থেকে সব কাদা ধুয়ে গেলে টলটলে জলে যেমন নদীর তলার লতাপাতা নানা রকম ভাসে, তেমনি ভেসে উঠতে থাকে—এই সব বিছনের নাম, সারের নাম, জলের নাম যে ছোট দাদা বলছে, তার ভিতর বুড়িমার গোতের কোনো স্মৃতি নেই, বুড়িমার ক্ষেত বাড়ির কোনো কথা নেই।" ৮৯

প্রচুর প্রবাদ প্রবচন তিস্তা পুরাণের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবাদ বাক্যগুলি আপ্ত বাক্যের মত ব্যবহৃত হয়ে উপন্যাসের পৌরাণিক আবহকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। প্রবাদ-প্রবচন গুলি রাজবংশী ভাষায়—।

(১) 'অতি বিয়াত্তীর না-হয় বিয়া, অতি-ছোয়াত্তীর না-হয় ছোয়া।' ৯০

(২) 'ঘেগী না পারে ঘেগ ঢাকিবার, পেটেলী না পারে প্যাট ঢাকিবার।' ৯১

(৩) 'কুমড়ার চালাত কুমড়া নাই, কুমড়া ফলিছেন গুয়াগাছের মাথাত।' ৯২

(৪) 'ন্যাংটার নাই বাট পাড়ের ভয়। হালুয়ার নাই হারিবার ভয়।' ৯৩

(৫) 'গোহালিয়া মুখা বলদা আর ঘরমুখা হালুয়া আর বৌমুখা ঘরুয়ার দুইখান চোখ একখান করি কমি যায়।' ৯৪

(৬)'দিনের আলোয় বিলাই কানা, জমির আইলে হালুয়া কানা।' ৯৫

(৭) 'আসিলে বসিলে গুতিয়া, ডাকিলে ডুকিলে ছোয়া।' ৯৬

প্রবাদ প্রবচন গুলির মতো রাজবংশী ছিল্‌কা, ছড়া ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। বক্তব্যকে আরো অধিক অর্থবহ করে তুলেছে।

ছিলকা: (১) 'যে হাটে নাই যাই, সে হাটের শেষ নাই।'৯৭

(২) 'কয় হাটের ছোয়াই', কাকাক ডাকে বিয়াই।' ৯৮

(৩) 'জাই গেল ক্ষেতবাড়ি, মধ্যে হইল পথ

জাই গেলেন গিরির বৌ, নিত্য যাছে হাটত।' ৯৯

(৪) 'আই আই, আই ঘর আছে তার দুয়ার নাই।' ১০০

(৫) 'হিতি গেনু, উতি গেনু, গেনু মরা ঘাট

অ্যাকো গাছ দেখিবার ধইরছু ফলের উপর পাত।' ১০১

(৬) 'মোর কপালের গুণে মুই হছি বেটি ছোয়া

না-হইলে কোটত পাইতাম অ্যানং ছোয়া পোয়া।' ১০২

(৭) 'সকালের খোয়া খোক্‌সা ভাত

দুপহরের খোয়া মুড়ি

বিকালের খোয়া চা আর চুড়া

সনঝার খোয়া ভারী।' ১০৩

(৮) 'সময়ে শুইলে মাইয়া, অসময়ে শুইলে ছাইয়া।' ১০৪ ইত্যাদি

ছড়া: (১) 'নামি আসিছেন তিস্তার বুড়ি-।

উঠি আসিছেন তিস্তাবুড়ি।

....'১০৫

(২) ' উতরা কুমলাইয়ের জল

তিস্তা বুড়ির মাটি মিশল

....' ১০৬

(৩) 'নোকটুরে নটুয়া

বলদখানের খটুয়া

....' ১০৭

গান: (১) 'ও পরাণ সাধুরে

বড় নদীর তালাস করিবেনা না।' ১০৮

(২) 'হাম ভুখসে মরলেওয়ালে, কিয়া মৌতসে ডরনেওয়ালে?

আমাদিকা ডাঙ্কা বাজাও, উধাও অগ্নিধ্বজা,

আব কোমর বান্ধো, তৈয়ার হও, লাখো কোটি ভাইয়োঁ।' ১০৯

(৩) 'ও মোর দাঁতাল হাতির মাহুত রে'। ১১০

'পুরাণ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'পুরাতন' বা প্রাচীন। কিন্তু 'পুরাণ' বলতে বোঝায় 'ব্যাসাদি রচিত সর্গাদি পঞ্চ লক্ষণ শাস্ত্র বিশেষ।' 'সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ। বংশানু চরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।' (অথর্ব্বেদ ১১.৭.২৮। শত পথ ব্রাহ্মণ ১১.৫৯.৮।) ১১১

পুরাকালের অলৌকিক নীতি কথামূলক আখ্যান কাহিনিই সাধারণভাবে পুরাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। দেবেশ রায়ের পুরাণ সে পুরাণ নয়, এ কালেরই মানুষের পুরাণ। কিন্তু এ পুরাণের পরিবেশ ঐ পুরাণের আবহ মণ্ডিত। ভাষাতেও তার লক্ষণ নিহিত আছে। যেমন পুরাণে ঘটে থাকে তেমন আবহ সূচক কথা—

"বুড়িমা কি উড্ডীয়মান ভুটান পাহাড়ের পাখা কেটে দিয়েছিল, যেমন পুরাণে ঘটেছিল কখনো? অথবা, বুড়িমা বাধ্য করেছিল ভুটান পাহাড়কে অন্য কোনো দিকে উড়ে যেতে আর ভুটান পাহাড় সেদিকেই উড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সেদিকে এখন ভুটান পাহাড়, যেমন পুরাণে ঘটতে পারত কখনো? অথবা বুড়িমা কি তার দুই পায়ের কোনো এক পায়ের বুড়ো আঙুল মাটিতে টিপে থামিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর কম্পন, আর সে কম্পন পৃথিবীর ভিতর দিকেই বয়ে গিয়েছিল, যেমন পুরাণে ঘটেছিল কখনো? অথবা বুড়িমা বাধ্য করেছিল যে মরুদেশ জল শুধু শুষেই নেয় অথচ ফিরিয়ে দেয় না একবিন্দু, সেই মরুদেশকে দশ নদী বিশ নদী থেকে অন্য এক দূরত্বে চলে যেতে, মরুদেশের সে পুরাণ দেখে এসেছিল হাজুয়া মোহম্মদ? অথবা, বুড়িমা সেই ভাষা হর বাতাসের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল, যেমন পুরাণে প্রায়ই ঘটে থাকে?" ১১২

পুরাণ দ্যোতক বাক্য: "বাপার বাপার বাপার বাপা একটি জঙ্গলবাড়িতে শ' খানেক গাছের চারা লাগাতে দেখেছিল—সেই বাপার বাপার বাপার বাপা যখন ফরেস্ট ধরে যাতায়াত শুরু করেছে সেই বয়সে। তারপর বাপার বাপার বাপার বাপা আরো জোয়ান হয়েছে, তার বিয়া বসিছেন, তার একখানের জায়গায় দুইখান, দুইখানের জায়গায় তিনখান বিয়া হবা পারে, একখান বনুস মরি যাবার পর আর একখান বনুস হবা পারে,

একবারে তিনখান বনুসও হবা পারে, স্যালায় বাপোর বাপোর বাপোর টাইমত কী চিন্তাখান করি ছিলেন সেই কথা কায় জানিবে?" ১১৩

পুরাণ বোধক শব্দ: মানব জন্ম, ত্রিভুবন জোড়া, জন্ম জন্মান্তর, ইহজন্ম-পরজন্ম, এক জন্ম, দেশ-দেশান্তর, অলৌকিক, পৌরাণিক, দার্শনিক, সাইটোন দেবী, জল্পেশ্বর ইত্যাদি।

তিস্তা পুরাণে কিছু অপ্রচলিত ও অল্প প্রচলিত শব্দ পাওয়া যায় যা তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নেই। কাপোড়িয়া, ভ্যানিসুয়া, নারিকেলুয়া, বাজুনিয়া, হাটুয়ানী, এককুড়ি এগার, হাটোয়াল, গদিয়াল, ক্ষোতোয়াল, বিয়াস্তি, জুয়াস্তি, বেমাসিয়া, শিকস্তি-পয়োস্তি, বে-মালিক, মাথোয়াল, গুতিয়া, টিমুল, অনালাপ, শিউরোনি, না-ছাড়ানি, স্বাস্থল, ব্লকবাবু, হাইলজুর, ভ্যানোয়াল, টিকিটোয়াল, ছিটিয়াল প্রভৃতি—

তিস্তাপুরাণেও রাজনীতির কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আছে। বিশেষত 'আরম্ভ', 'আরম্ভের পর', ও 'আর এক আরম্ভ' পর্বের বৃহদংশ জুড়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকান্ড। লেভি, বা বাগানের জমিদখল, অপারেশন বর্গা ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। সেই সূত্রে বেশ কিছু রাজনৈতিক শব্দ এর ভাষাকে পুষ্ট করেছে। যেমন— লেভি, ব্লক অফিস, মিটিং, মিছিল, লালঝান্ডা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস (আই), বাংলা কংগ্রেস, উচ্ছেদ, দখল, অপারেশন বর্গা, ডিমান্ড, ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত, গিরি, জিন্দাবাদ, ভোট, মন্ত্রী, আধিয়ার, স্লোগান, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট, কমরেড, পাওয়ার ক্যাপচার, লিডার, মজদুর কিষাণ, স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিস ইত্যাদি।

রসরসিকতা ঃ

রসবোধ রাজবংশী জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সব কাজ ও কথার মধ্যে রসাত্মক শব্দ, বাক্য প্রয়োগ করে বিষয়কে হৃদয় গ্রাহী করে তোলা রাজবংশী জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐ জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক উপন্যাসে অনাবিল রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কখনও প্রবাদ, কখনও ছড়া-ছিলকা-গান আবার কখনও সাধারণ কথার মধ্যে রস-রসিকতার অবতারণা করা হয়েছে। কৌতুকপূর্ণ কথা কখনও আদিরসের সীমা স্পর্শ করেছে। অদিরস রাজবংশী জীবনবোধে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

'সবকিছুর পেছনে' অধ্যায়ে, বুড়িমার গোতের জংলু তার বৌকে সঙ্গে করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে যায়, সন্তান না হওয়ার জন্য তলপেটের ভেতর একটা পরিয়ে নেওয়ার জন্য। সে আগে থেকে বৌকে কিছু বলেও নি। হাসপাতালে একটা ফাঁকা ঘরে বৌকে একা চিৎ করে শুইয়ে যখন সেটা পরানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয় বৌ তাড়াক করে উঠে একেবারে বাইরে চলে এসে চিৎকার শুরু করে সবাইকে অপ্রস্তুত করে দেয়। বাড়িতে এসে

স্বামীকে জব্দ করার জন্য অভিযোগের সুরে বলে "ঐ উমরায় মোরকম দেখিছে যে হাসপাতালত মোর ভিতর এগিনায় যন্তর ঢুকাবার নিগায়?' কয়েকদিন কাটারপর সমবয়সী অন্য বৌরা এই বৌকে বোঝাতে থাকে, 'ঐ ঠে যে কিছু পিঙ্কিস নাই তো অ্যালায় কিছু সিন্ধা কেনে।" ১১৪

'খোঁজ খবর' ধানরামের খাওয়ার নিপুণতা টুলটুলীর বক্তব্যে রসবোধের পরিচয় বহন করে এনেছে। ধানরাম তার পাতে ভাত দেওয়ামাত্র চেটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে। তা দেখে টুলটুলী বলে 'চাটিচাটি' আঙ্গুল খান সরু করি ফেলালেন হালুয়া, হাল ধরিবেন— ক্যানং করি—?'

'শলাপরামর্শ' অধ্যায়ে লেভি ব্যাপারে ধানরামকে জানার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সে ফিরে এলে তাকে দোলান জিজ্ঞাসা করে কী হলো! ধানরাম কিছু উত্তর দেয় না। তখন তাকে খোঁচাবার জন্য বলে 'তোর তো আবার ভাত খোয়ার বাদে আঙ্গুল খোয়া লাগিবে।' ধানরাম তো এবার সত্যি সত্যি আঙ্গুল চুষতে চুষতে বলে "সগাকই আঙ্গুল খোবার লাগিবে। হাতের আঙ্গুল। পাওয়ের আঙ্গুল। গোলাঘরত ধান যা আছে সরকার আসি নি যাবে। টাকু পাইকার কহিল।" ১১৫ লেভিদিলে যে সবার আঙ্গুল চুষতে হবে অর্থাৎ অনাহারে মরতে হবে— সে কথাই রসচ্ছলে বলা হল।

'গুহাপথে' যখন বুড়িমার বাড়ির লোকেরা লাইন বেঁধে হাটে যাচ্ছে, ঝোপঝার লতাপাতার পথ; ছোটদাদার মাথার খাড়া চুলে লতাপাতা আটকে থাকে। তা দেখে ধানরাম রসিকতা করে বলে—"ছোট দাদা তোর মাথাত তো গাছ গজাবার ধরিসে। চুল ঝাড়ি দে। কাউয়া ছৌ মারিবে।" ১১৬ ছোটদাদা আশঙ্কায় সত্যি চুলে একবার হাত বুলিয়ে নেয়।

'জোতদার' অধ্যায়ে গদিয়াল বাবুর গদিতে মিটিং এ সবাই বসেছে। ভোলা জোতদার এসে জুতো কোথায় রাখবে বলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তা দেখে গদিয়ালবাবু বলে—'গদির নীচে রাখুন না। কেউ নেবেনা।' এর উত্তরে ভোলা জোতদারের সহজ রসিকতা—"ঐঠে রাখিলে তো পায়ের ধাক্কাত ভিতরত্ চলি যাবে। স্যালায় যাওয়ার তানে পুরা গদিখান উল্টিবার লাগিবে"১১৭ 'উপদেষ্টা খোঁজা' অধ্যায়ে নিছাড়ানি বর্ষার পর শীত আসে, শীতও যায় যায় করে এখন যে ঠিক কোন ঋতু, কী চাষ করা যাবে বুড়িমার গোতের লোকেরা সেই পরামর্শ করার জন্য দুদুয়ার পারের ভাটিয়াদের পরামর্শ চায়। ভাটিয়ারা আসে। তাদের মধ্যে একজন গোঁফ-দাড়ি, লম্বা চুলওয়ালা লোকছিল। তাকে দেখে বাঙ্কুরাম হেসে কুটি কুটি। মস্করা করে বলে 'এই গোঁফ আর চুল কোটত ভাড়া করি আনিলেন টানি দেখিম?' দুদুয়া পারের এক ছোড়করার প্রত্যুত্তরও রসবোধ পূর্ণ। বলে

" টাইন্যা দেইখবেন ক্যান? ঘরে রাইখ্যা দ্যান। আমরাও তো আনছি এই দ্রব্য এইখানে জমা কইর‍্যা যাব। ঐখানে তো এই দ্রব্য আমরা আর পুষাইতে পারিনা। সকালে দুই পোয়া সরষ্যার তেল লাগে শুধু চুলে আর গোঁফে। গাওখান তো দেইখতেছেনই। প্যাটখানও দেখেন। রাইখ্যা দেন। দেইখ্যা দেইখ্যা সুখ পাবেন।" ১১৮

দুদুয়ার পারের ভাটিয়ারা এখন কী ফসল ফলানো যায় সেজন্য মাটি পরীক্ষা করছিল কোদালে মাটি কোপ মেরে। এদের মধ্যে একজন আন্ডারওয়ার পরা, একজন তিলক কাটা ও একজন লুঙ্গিকাছা লোক ছিল। লুঙ্গি কাছা লোকটার একটা কথার উত্তরে আন্ডাওয়ার একেবারে আদিরসের অবতারণা করে তার কথা নস্যাৎ করে দিল। বলল. 'আইলেন আমার নবদ্বীপের মা-গোঁসাই। টকর টকর কথা। ধানের শিকড় পইচবে! আরে একখান-হালের জায়গায় দুইখান হাল একহাত কইর‍্যা ঢুকাইয়া মাটি তুইল্যা আটদশদিন ফেইল্যা রাইখলে মাটি শুকাইব না? মাইয়া ছেলের পাছা দেইখবার ধরছে। শালো, পোলাপান কি মাইয়া ছেলের পাছা দিয়া হয় না তলপ্যাট দিয়া হয়? না বাবু, হালদিয়া ফালাইয়া রাখেন। শুকাইয়া যাবে মাটি!' ১১৯

'হাওয়াবদল' অধ্যায়ে নিছাড়নি বর্ষার পরের শীত কাটার পর নানা ঘটনার পর একটি বড় ঘটনা হলো সাগাই বা কুটুম আসা। একের পর এক সাবাইয়ের আগমন এমনি যে কেউ কাউকে যেন চিনছেইনা। একদিন রাতে খাওয়ার সময় ডাইকী তার স্বামী দেরুকে পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে 'বসেন বিয়াই বসেন।' শুনে দেরু যে সে পিঁড়ি দিয়ে বউকে প্রায় মারার উপক্রম। রসিকতা করে বৌকে বলে "একোখান বেটার বৌ ঘরত আনি কি দিনোরাত বেয়াইয়ের কথা ভাবা ধরিছেন? ভাতারক কছেন বেয়াই।" ১২০

'আওয়াজবদল' অধ্যায়ে বুড়িমার গোতে নানা আওয়াজের মধ্যে জলের পাম্পের ভট ভট আওয়াজ দিনরাত হয়ে চলেছে। সে আওয়াজ প্রসঙ্গে পাথারনীর নাতি ভাদইয়ের বেটার বউ সোমারী বলে "মোর তো পাম্পেরভট ভট শুনিলে বিয়া বিয়া মন খায়।' তার জবাবে পাথারনী-ই তার নাত বৌয়ের বেটার বৌয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করে বলে 'অনং বিয়া বিয়া করিস কেনে। ঐ শুনিলে মোর ডর ধরিবার ধরে, প্যাটের ভিতর আর একখান কায় ধক ধক করিবার ধরিছে। সেই খরার পাকের লেভীর নাখাল। আবার পেটেলী হবার ধরিম না তো?' একথা শুনে ধাত্রী সোন্দনী বলে—'শুনিম কেনে? মুই তো আওয়াজ খান কানত না তুলি।' মননী বলে 'মোর তো শুনিবার মন লাগে রে—। মানষিলার গন্ধ পাই। কান্টী মস্করা করে বলে ' মানষিকই তো ভয়।'"১২১ ঢেকী বলে ওঠে 'মানষিক ভয় পাইস এতখান, মানষির গাওয়ত পা তুলি না দিলে তো ঘুম আসে না এক রাতিত। মানষি তোক কবে ডরাইছেরে কান্টী?'

'শাড়ি' অধ্যায়ে, দিদিমনির দেখা দেখি মেয়েরা, মেয়েদের দেখাদেখি বাড়ির বৌরাও শাড়ি পরা শুরু করেছে। কিন্তু ফোতা ছেড়ে শাড়ি পরতে গিয়ে অনভ্যাসে একদিন মননী কুয়োপাড়ে কয়েকটা বাটি ধুতে গিয়ে উল্টে পড়ে যায়। কান্টি ধরে ফেলে। এরপর মননী কোনো শাড়ি পড়তে গেলেই অনেকে রসিকতা করে বলে—'আগত তোর পাছাখান ঠিক কর, তার বাদে পাছা ঢাকিবার ধরিস।'

বুড়িমার বাড়ির মেয়ে বৌদের শাড়ি পরার হিড়িক ক্রমশ বেড়ে চলছিল। এটা দেখে সোন্দনী একদিন মেয়েদের বৌদের রসিকতা করে বলে উঠেছিল " অ্যানং শক্ত করি দুধ বান্ধিবার ধইরছিস, ছোয়া খোয়ার বুকের দুধ আসিবে ক্যানং করি?" ১২২

'কথান্তর' পর্বে - 'বুড়িমা' অধ্যায়ে ছোটদাদার ফিরে আসায় বুড়িমার গোতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বিসারু বলে— "ছোট দাদাখান ফিরি আসিছে আর মোর মনতখাছে কী মোর এই বুড়িমার গোতত্ এককেরে এক শেয়ান ছোয়ার জন্ম হইল।' একথা শুনে সোন্দনী রসচ্ছলে বলে 'ঐলা একখান ছোয়া প্যাট থিক্যা বাহির করিবার তানে তো দশখান মাও লাগিবে। একখান মাওত্ না হয়।" ১২৩

হারিয়ে যাওয়া বুড়িমাকে অবশেষে পাওয়া গেল সানঝুর বড় ছেলের বৌ দেবারীর ঘরে। রাতে সেখানেই ছিল কেউ দেখতে পায়নি। এতে দেবারী লজ্জাপায়—"দেবারী ডান গালে ডান হাতের চার আঙ্গুল দিয়ে গর্ত করে বলে ওঠে —'মা-ই গে, কালি সারারাত মোর ঠে ছিল, শাসের আওয়াজ খানও তো পাই নাই।' এতে দুখারুর মাইঝন বেটার বৌ ঝারী বলে ওঠে 'দিদিগে দিদি, তোর মুখ ক্যানং রাঙ্গা। ভয় খাছিস ক্যানে? বুড়িমা তো কিছু দেখিবার পায় না। আর, রাতিত তো ঘর আন্ধার থাকে।" ১২৪ দেবারীর যা আশঙ্কা তাতে জলঢেলে দিয়ে ঝারীর উক্তি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ও রসাত্মক।

'হারানো প্রাপ্তি' অধ্যায়ে ধানরাম শাদুরীর বেটার বৌ বাঙ্গারী নাত বৌ এসে গেলেও এখনও কানে মাকড়ি পরে; সে মাকরি দোলে।—তার এই মাকড়ি পরা নিয়ে তার শাশুড়ি রসিকতা করে বলে— "উমরার এতখান বাবু, মাকড়ি না পরিলে উমরার মাথাক্ সগায় পাছা ভাবিবে।' বাঙারি এতো বেঁটে যে তার মাথার চুল পাছা পর্যন্ত ঠেকে। বাতাসে দোলে, ছড়ায়। অন্যান্য শাশুড়িরা বলে—"বেটিছোয়ার পাছাত কি চুল গজায়! এই রসিকতার জের টেনে অন্য বৌরা বলে ওঠে—'গেইল রে, গেইল রে বাওয়ের টানে পাছার চুলের ভারে ঘাড়খান মট্কি গেইল রে।" ১২৫

১। The Rajbansis of North Bengal, Charuchandra Sanyal, The Asiatic Society, Kol-60, 1st Published in 1965, reprinted in 2002, Page-10

২। ভাওয়াইয়া, সুখবিলাস বর্মা, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৪

৩। উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, নির্মল দাশ, সাহিত্য বিহার, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১৩

৪। তদেব পৃঃ ২৫

৫। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ১৯৬

৬। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ৩১৯-২০

৭। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃঃ ১৮৪

৮। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ২৮৯

৯। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১ পৃঃ ১২৭

১০। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ৬৬

১১। অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৪০৭, অক্টোবর ২০০০, তিস্তাপারের অস্থির (?) বৃত্তান্ত, পৃঃ ৩২৪

১২। বাংলা উপন্যাসে 'ওরা', শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৫

১৩। শৈলী চিন্তা চর্চা, সংকলন ও সম্পাদনা বিপ্লব চক্রবর্তী, রত্নাবলী, জুলাই ২০০৩, পৃঃ ৩২৩

১৪। সাহিত্যের পথে (সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধ) রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২, দ্বাদশখন্ড, পৃঃ ৪৮৮।

১৫। The craff of fiction (percy lubbock, 1947) P-25.

১৬। Jane Austen's Novels-Andrew H. Wright (1957), P-195

১৭। সাহিত্য কোষ ঃ কথা সাহিত্য, সম্পাদনা, অলোক রায়, সাহিত্য লোক ২০০২, পৃঃ ২২০

১৮। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃঃ ১৩

১৯। তদেব পৃঃ ২৭৮

২০। তদেব পৃঃ ২২০

২১। তদেব পৃঃ ১৬৪

২২। তদেব পৃঃ ১৭৯

২৩। তদেব পৃঃ ১৮১

২৪। তদেব পৃঃ ১৮৩

২৫। তদেব পৃঃ ১৪১

২৬। তদেব পৃঃ ৪২৯

২৭। তদেব পৃঃ ২০৭

২৮। তদেব পৃঃ ৮১

২৯। তদেব পৃঃ ২১১

৩০। তদেব পৃঃ ২২০

৩১। তদেব পৃঃ ২৩২

৩২। তদেব পৃঃ ৪১৬

৩৩। তদেব পৃঃ ১৩৮

৩৪। তদেব পৃঃ ৩৭৪

৩৫। তদেব পৃঃ ৩৮১

৩৬। তদেব পৃঃ ৩৩

৩৭। তদেব পৃঃ ৩৯

৩৮। তদেব পৃঃ ১১৩

৩৯। তদেব পৃঃ ৮৩

৪০। তদেব পৃঃ ৮৩

৪১। তদেব পৃঃ ৭৬

৪২। তদেব পৃঃ ৭৭

৪৩। তদেব পৃঃ ৩৯

৪৪। তদেব পৃঃ ১৯৮

৪৫। তদেব পৃঃ ১৩৩

৪৬। তদেব পৃঃ ১৪৬

৪৭। তদেব পৃঃ ১৪৭

৪৮। তদেব পৃঃ ৭৪-৭৫

৪৯। তদেব পৃঃ ১২৯

৫০। তদেব পৃঃ ১৬৭

৫১। তদেব পৃঃ ৪২৫

৫২। তদেব পৃঃ ৪৭৪

৫৩। তদেব পৃঃ ৪৭৫

৫৪। তদেব পৃঃ ৪৫

৫৫। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৬। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৭। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৮। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৯। তদেব পৃঃ ৩০২

৬০। তদেব পৃঃ ৩১৬

৬১। তদেব পৃঃ ৩৪৮

৬২। তদেব পৃঃ ৩৫২

৬৩। তদেব পৃঃ ১২৪

৬৪। তদেব পৃঃ ১৫৯

৬৫। নাট্যপত্র ঘরে বাইরে, প্রথম বার্ষিকী সংখ্যা, জুলাই ২০০১, পৃঃ ২২১

৬৬। তদেব পৃঃ ২২১

৬৭। তদেব পৃঃ২২১

৬৮। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা একাদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ৩৮৭

৬৯। 'প্রতিবিম্ব' ২য় পর্যায়, তিস্তাপুরাণ প্রসঙ্গে, ২ সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃঃ ১

৭০। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৯৯

৭১। তদেব পৃঃ ৫৫৭

৭২। তদেব পৃঃ ৫৫৭

৭৩। তদেব পৃঃ ৩৭

৭৪। তদেব পৃঃ ৫৫

৭৫। তদেব পৃঃ ৬০

৭৬। তদেব পৃঃ ১৯০

৭৭। তদেব পৃঃ ১৯

৭৮। তদেব পৃঃ ২৩৯

৭৯। তদেব পৃঃ ৪২৯

৮০। তদেব পৃঃ ১১৪

৮১। তদেব পৃঃ ৩৪৭

৮২। তদেব পৃঃ ৩৬৬

৮৩। তদেব পৃঃ ৩৬৬

৮৪। তদেব পৃঃ ৫০৪

৮৫। তদেব পৃঃ ৫০৭

৮৬। তদেব পৃঃ ৫৫৫

৮৭। তদেব পৃঃ৫৫৮

৮৮। তদেব পৃঃ ৬০৬

৮৯। তদেব পৃঃ ৩৪৬

৯০। তদেব পৃঃ ৬৩

৯১। তদেব পৃঃ ২৯৬

৯২। তদেব পৃঃ ২৯৬

৯৩। তদেব পৃঃ ৩২৮

৯৪। তদেব পৃঃ ৩৭৫

৯৫। তদেব পৃঃ ৩৩০

৯৬। তদেব পৃঃ ৪৮৮

৯৭। তদেব পৃঃ ২২৬

৯৮। তদেব পৃঃ ২২৮

৯৯। তদেব পৃঃ ২২৯

১০০। তদেব পৃঃ ৭৮

১০১। তদেব পৃঃ ৭৮

১০২। তদেব পৃঃ ১৭৭

১০৩। তদেব পৃঃ ১৯১

১০৪। তদেব পৃঃ ৪৮৬

১০৫। তদেব পৃঃ ৬৮২

১০৬। তদেব পৃঃ ৭৫

১০৭। তদেব পৃঃ ৭৫

১০৮। তদেব পৃঃ ৯৯

১০৯। তদেব পৃঃ ৩৭৮

১১০। তদেব পৃঃ ৬৪৯

১১১। বঙ্গীয় শব্দ কোষ, দ্বিতীয় খন্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি ১৯৬৬, নতুন দিল্লী, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, পৃঃ ১৩৪৫

১১২। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ২৮৮

১১৩। তদেব পৃঃ ২১

১১৪। তদেব পৃঃ ১৮৩

১১৫। তদেব পৃঃ ২১৩

১১৬। তদেব পৃঃ ২৪১

১১৭। তদেব পৃঃ ২৫৯

১১৮। তদেব পৃঃ ৫০৭

১১৯। তদেব পৃঃ ৫১১

১২০। তদেব পৃঃ ৫৬৯

১২১। তদেব পৃঃ ৫৮১

১২২। তদেব পৃঃ ৬০০

১২৩। তদেব পৃঃ ৬৯০

১২৪। তদেব পৃঃ ৩৯

১২৫। তদেব পৃঃ ৩৫